দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

প্রথম বর্ষ •১০ ম সংখ্যা •১২ আগস্ট ২০২৪

ভিতরের পাতায়

- অনিশ্চিত বাংলাদেশের হাল এখন মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে ২
- বঙ্গবন্ধু ৫
- ভূইঁয়া সফিকুল হক বড় আমলা ছিলেন। হাসিনার কারণে পদ হারান। ৫
- উল্লাসের চিৎকার এবং সজোর হাততালিতে কারও স্বপ্ন ভেঙে না দিই! ৬
- উদীচীর সংস্কৃতিকর্মী সমাবেশ সহিংসতাকারীদের শাস্তি দাবি ৭
- হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, সাম্প্রদায়িকতা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮
- নাগরিক স্মৃতিচারণা ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর মহানুভবতা সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শিবনাথ শাস্ত্রী ১০
- 'আমরা বিজ্ঞানী ভিখারি নই' : সম্মুখ সমরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস বনাম কেন্দ্রীয় সরকার ১২
- স্মরণ ঃ চলে গেলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ১৪
- বাংলায় মৌলবাদী মুসলিমপন্থী সংগঠন ১৬
- অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে গেলে অসংগঠিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে ১৯
- জরুরি অবস্থা বনাম মোদী জমানা এবং ফ্যাসিবাদ ২০
- এবারের লোকসভা নির্বাচন পক্ষপাতদুষ্ট চরম অনৈকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে – অ্যাসোশিয়েশন অব ডেমোক্রেটিক রিফর্মসের রিপোর্ট ২২
- হকারি ও বুলডোজার রাজ (তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশ ও হক কথা) ২৪
- বিজেপি'র ঘোলা জলে মৎস্য স্বীকার ২৫

সম্পাদক

শান্তনু দত্তচৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com

ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

স্বাধীনতা ও সংবিধান

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সিপাহীদের বিশাল স্বতস্ফূর্ত বিদ্রোহ ঘটে। সেই বিদ্রোহ দমন করতে ইংরেজরা সক্ষম হয়। কিন্তু স্বাধীনতার চেতনা বিলুপ্ত হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কবি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় লেখেন

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায় !
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গসুখ-তায় হে,
স্বর্গসুখ তায় !

এর কিছুদিন পরেই ১৮৮৫ সালে গঠিত হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন সারা দেশে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। একই সময় শুরু হয় গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলন। ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান ছড়িয়ে পড়ে বাংলার পথে প্রান্তরে। ১৯১৫ সালে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরে আসেন তাঁর আন্দোলনের অস্ত্র নিয়ে। রাউলাট অ্যাক্ট-এর বিরুদ্ধে অমৃতসরের জলিয়ানওয়ালাবাগের শান্তিপূর্ণ সমাবেশের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ইংরেজ সৈন্যরা সহস্রাধিক নরনারীকে হতাহত করে। সারা দেশ জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়। একাধিক কেন্দ্রীয় অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন, আগস্ট বিপ্লব , স্থানীয় ভিত্তিতে অসংখ্য গণ সংগ্রাম, নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রভাব , নৌ বিদ্রোহ সব কিছুর সম্মিলিত আঘাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে দেশ ত্যাগ করে। এই কাজে তাদের সহায়ক ছিল সাম্প্রদায়িক শক্তি মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা ও আর.এস.এস।এরা কোনোদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেয় নি।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হয়। এর চার মাস পর হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করে। স্বাধীন দেশ এই দুঃসময় কাটিয়ে এই নবীন প্রজাতন্ত্রের সংবিধান প্রণয়ন করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যারা কোনোদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেয়নি তারা আজ ভারতের শাসন ক্ষমতায় আরোহণ করে এই প্রজাতন্ত্রের সংবিধানকে বানচাল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই মুহূর্তে দেশের সমস্ত ধর্ম নিরপেক্ষ ও দেশপ্রেমিক শক্তির কর্তব্য সর্ব শক্তি দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলশ্রুতি এই সংবিধানকে রক্ষা করা।

অনিশ্চিত বাংলাদেশের হাল এখন মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে

মিলন দত্ত

মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর কার্যত তিন দিন দেশ সরকারশূন্য ছিল। দেশজুড়ে নৈরাজ্য বিরাজ করেছে। ৮ অগস্ট বৃহস্পতিবার রাতে বঙ্গভবনে ১৭ সদস্যের অন্তর্বর্তী সরকারের ১৪ জন শপথ নিয়েছেন। বাংলাদেশের এই অবস্থাকে ইউনূস বর্ণনা করেছেন 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' হিসেবে। কিন্তু একাত্তরের প্রথম স্বাধীনতার রূপকার মুজিবর রহমানের মূর্তি গুঁড়িয়ে দেওয়াকে তিনি আন্দোলনরত ছাত্রদের মতোই কার্যত ঠিক কাজ বলেই মেনেছেন।

৮ অগস্ট রাতে সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেওয়ার পর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ড. ইউনূস বলেন, 'অরাজকতার বিষবাষ্প এখন যে-ই ছড়াবে, বিজয়ী ছাত্র-জনতাসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পূর্ণ শক্তি তাকে ব্যর্থ করে দেবে।' আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই সমন্বয়ক মোহম্মদ নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ নতুন সরকারে উপদেষ্টা হিসেবে যুক্ত হয়েছেন; দেশের ইতিহাসে প্রথম। উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিয়ে গণ-অভ্যুত্থানে জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে কাজ করার কথা বলেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, 'আমরা যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত করেছিলাম, যে প্রতিশ্রুতির জন্য শত শত ভাইবোন হতাহত হয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতেই আমরা সরকারে এসেছি। সেই প্রতিশ্রুতিগুলো দ্রুত পূরণ করার জন্য সচেষ্ট থাকব।' কিন্তু ক্ষমতার এত কাছে পৌঁছে বিএনপি বা জামাত কি চুপ করে বসে থাকবে? নাকি তাদের এজেন্ডাগুলো পূরণ করার দায়িত্ব নেওয়ার মতো লোক তারা পেয়ে গেছে। বাংলাদেশকে এখন সামনের দিনগুলোতে আরও অনেক কিছু দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চাপে সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবির মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন শেখ হাসিনা। পরে দেশ ছেড়ে পলায়ন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছোট বোন শেখ রেহানা। সংঘাত ঠেকাতে না পারায় তাঁকে পদত্যাগ করার জন্য ৪৫ মিনিট সময় দেয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। পদত্যাগের পর ৫ আগস্ট বেলা আড়াইটার দিকে বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। বঙ্গভবন থেকে একটি সামরিক হেলিকপ্টার শেখ হাসিনাকে নিয়ে যাত্রা করে। তার আগে একটি ভাষণ রেকর্ড করে যেতে চাইলে শেখ হাসিনা সেই সুযোগ পাননি। একটি মিলিটারি হেলিকপ্টারে চড়ে শেখ হাসিনা সেনা বাহিনীর বিমানবন্দরে যান। সেখানে আগে থেকেই দুটো গাড়ি তৈরি ছিল। হেলিকপ্টারটি থেকে নেমে তাঁরা বিমানে উঠে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হল। পরে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গণভবন অভিমুখে যাত্রা কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছেড়েছেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, দেশে একটা ক্রান্তিকাল চলছে। সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের আমন্ত্রণ করেছিলাম। আমরা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে দেশের সব কাজ চলবে। হাসিনা এখন দিল্লিতে আছেন। যতদিন না তিনি অন্য কোনও দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে পারছেন ভারতেই থাকবেন বলে জানা গেছে।

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন গত ১১ জানুয়ারি। এর আগে ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদে নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা। এরপর ২০১৪ সালে দশম সংসদ নির্বাচন হয় একতরফা, যেখানে বিরোধী দলগুলো অংশ নেয়নি। ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। এই নির্বাচন আগের রাতেই ব্যালটে সিল মারার ব্যাপক অভিযোগ ছিল। এ নির্বাচন 'রাতের ভোট' নামে পরিচিতি পায়। আর চলতি বছরের জানুয়ারিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি আবার

প্রধানমন্ত্রী হন। তবে এ নির্বাচনও বিতর্কিত। এতেও প্রধান বিরোধী দলগুলো অংশ নেয়নি। দলীয় নেতাদের স্বতন্ত্র প্রার্থী করে 'ডামি' প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন করা হয়। এ নির্বাচনটিকে বিরোধীরা 'ডামি নির্বাচন' বলে আখ্যা দেন। ছয় মাসের মাথায় ব্যাপক ছাত্র ও গণবিক্ষোভের মুখে তিনি পদত্যাগ করে দেশ ছেড়েছেন।

এসবের শুরু সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সরকারি চাকরির কোটা সংস্কার আন্দোলনকে সরকারবিরোধী আন্দোলনের রূপ দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রধানমন্ত্রীর আলোচনার আহ্বান উপেক্ষা করে সরকার পতনের এক দফা দাবিতে সর্বাত্মক অসহযোগের ডাক দেয়। ২৭ জুলাই ঢাকায় বিশাল সমাবেশ করে নাগরিক ছাত্রসংগঠন এবং পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে মিলে 'সম্মিলিত মোর্চা' গঠনের ঘোষণা দিয়ে তারা বলে , শিগগিরই তারা 'ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রূপরেখা' সবার সামনে আনবে। শিক্ষার্থীদের ওই আন্দোলনে প্রকাশ্যেই যোগ দেয় বিএনপি ও তার সহযোগী সংগঠনগুলো। সঙ্গে ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক, পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। ইতিমধ্যে ছাত্রদের ওপর বিভিন্ন স্থানে নির্বিচারে গুলি চলে। ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় দুই শত।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের সঙ্গে বসার আগ্রহ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, তকোটা আন্দোলনকারীরা যদি চায়, আমি তাদের সাথে বসব, তাদের কথা শুনব। তাদের দাবি-দাওয়া এ পর্যন্ত মেনে নিয়েছি। আরও কিছু আছে কি না; সেটা আমার শুনতে হবে। আমি সংঘাত চাই না। দরকার হলে অভিবাবকদেরও নিয়ে আসতে পারে।দ ফেসবুক বার্তায় সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, তখুনি সরকারের কাছে বিচার চাওয়া বা সংলাপে বসারও সুযোগ আর নেই। ক্ষমা চাওয়ার সময়ও পার হয়ে গেছে।দ এর কয়েক ঘণ্টা পরেই ঘোষণা হয় এক দফার; সরকার পতনের আন্দোলন। ২৮ জুলাই থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক যে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা হয়, তার রূপরেখা কী হবে সে বিষয়ে জানানো হয় সমাবেশ থেকে।

কোথাও ওই আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অভিভাবকরা। দুপুরে ঢাকায় যাত্রাবাড়ীর শনির আখরা ও কাজলা এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করা হয়। মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের উপরেও যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবর চত্বরে জড়ো হন সংগীত শিল্পীদের অনেকে। স্লোগানে স্লোগানে সংহতি জানান কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে গড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে। তখন সাংস্কৃতিক কর্মীদের কেউ কেউ যোগ দেন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। শিল্পকলা একাডেমির সামনে জড়ো হওয়ার পর নাট্যসংগঠন প্রাচ্যনাটের কর্মীরা সাদা কাপড় নিয়ে পদযাত্রা করে যোগ দেন শহীদ মিনারের জমায়েতে।

৩০ জুলাই কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঢাকায় সরকারকে 'অসহযোগ' এর কর্মসূচির ডাক দেয়। এ নিয়ে পুলিশের প্রস্তুতি এবং তা নস্যাৎ করা হবে কিনা; এমন প্রশ্নে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তআমরা নস্যাৎ করতে চাই না তো। দেশের জনগণ আন্দোলনে যুক্ত হয় হবে। সেগুলো আমরা নস্যাৎ করতে চাই না।দ তারা কোনো আক্রমণের শিকার হবে না কি না-আরেক প্রশ্নে কামাল বলেন, তআপনাকে যদি কেউ আক্রমণ করে তাহলে আপনি বসে থাকবেন? আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সেলফ ডিফেন্সের অধিকার দেওয়া আছে। আপনারও সেলফ ডিফেন্সের অধিকার আছে।দ সেলফ ডিফেন্সের নামে পুলিশ বেপরোয়া গুলি চালায়।

আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ চলাকালে ২৭ জুলাই দুপুরে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার মাওনা চৌরাস্তায় এক ব্যবসায়ী নিহত হন। ওই দিন বেলা ১১টা থেকে আন্দোরনকারীরা মাওনা চৌরাস্তার পল্লী বিদ্যুৎ মোড়ে অবস্থান নেয়। আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকরা মাওনা চৌরাস্তা ফ্লাইওভারের নিচে অবস্থান কালে উত্তেজনা দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘাত তৈরি হয়। এক পর্যায়ে আন্দোলনকারীরা তিনটি পুলিশ বক্স ও পুলিশের দুটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ছাত্র লিগ, যুব লিগ আর পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ হিসাত্মক চেহারা নিয়েছিল আগেই। গোটা দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে; ছাত্র, সাধারণ মানুষ, পুলিশ মিলিয়ে তিনশোরও বেশি মৃত্যু হয়।

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরে বিভিন্ন স্থানে

হিন্দু মন্দির, বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা শুরু হয়। তা চার দিন পরেও থামেনি। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এর সাধারণ সম্পাদক রানাদাশ গুপ্ত এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ৫ অগস্ট ও ৬ অগস্ট অন্তত ৯৭টি স্থানে সংখ্যালঘুদের বাড়ি ও দোকানে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়েছে। ১০টি মন্দিরে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। বাগেরহাট জেলায় একজন হিন্দু ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। প্রথম আলো জানিয়েছে, সোমবার নাটোর, ঢাকার ধামরাই, পটুয়াখালীর কলাপাড়া, শরীয়তপুর ও ফরিদপুরে হিন্দুদের মন্দিরে এবং যশোর, নোয়াখালী, মেহেরপুর, চাঁদপুর ও খুলনায় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা করা হয়েছে। দিনাজপুরে হিন্দুদের ৪০টি দোকান ভাঙচুর করা হয়েছে। এছাড়া রংপুরের তারাগঞ্জে আহমদিয়াদের উপাসনালয়ে হামলা ও ভাঙচুর করা হয। ঢাকায় সংগীত শিল্পী রাহুল আনন্দের বাড়িতে ভাঙচুর ও আগুন দেয়া হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের প্রধান ইফতেখারুজ্জামান এএফপিকে বলেন, ‘‘সংখ্যালঘুদের উপর এই ধরনের হামলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মৌলিক চেতনার পরিপন্থী।’’ ৬ অগস্ট ভারতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সংসদে বলেছেন, বাংলাদেসে সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি তারা নজরে রাখছেন।

হিন্দুদের নিয়ে বাংলাদেশে যা চলছে তাকে ছাত্ররা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নামে আখ্যায়িত করতে চায় না। বদরুদ্দিন উমরের মতো বামপন্থী বুদ্ধিজীবীও বলে থাকেন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় না, যেটা হয় সেটা সম্পত্তি দখলের মারামারি। প্রশ্ন নিছক সম্পত্তির লোভেই যদি হিন্দু রা আক্রান্ত হয় তাহলে মেয়েদের তুলে নিয়ে যায় কেন? নারীদের অসম্মান করা এ আক্রমণে প্রধান কাজ। সম্পত্তি হাতানোর জন্য বেছে বেছে হিন্দুরা টার্গেট হয় কোন ? গ্রামের দুর্বল মুসলমানরা নয় কন? কোন জবাব অবশ্য মেলেনি। হাসিনা দেশ ছাড়ার ছয় দিন পরেও হিন্দুদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

সজীব ওয়াজেদ জয় যা বললেন ঃ আওয়ামী লীগকে শেষ করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়। তিনি নেতা-কর্মীদের সাহস নিয়ে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘আমরা আছি।’ ৭ অগস্ট এক ভিডিও বার্তায় এসব কথা বলেন সজীব ওয়াজেদ। তিনি শেখ হাসিনার সরকারের অবৈতনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। এর আগে সোমবার শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছাড়ার পর সজীব ওয়াজেদ বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসকে বলেছিলেন, তাঁর মা আর রাজনীতিতে আসছেন না। পরদিন ডয়েচেভেলেকে জানান, শেখ পরিবারের কারও রাজনীতিতে আসার কারণ নেই।

সজীব ওয়াজেদ ভিডিও বার্তার শুরুতে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এখন দেশে একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি চলছে। সারা দেশে ভাঙচুর, লুটপাট হচ্ছে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চলছে, হত্যা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ দেশের সবচেয়ে পুরোনো এবং বড় গণতান্ত্রিক দল। আওয়ামী লীগ কিন্তু মরে যায়নি। আওয়ামী লীগ এই দেশকে স্বাধীন করেছে। আওয়ামী লীগকে শেষ করা সম্ভব নয়।’

শেখ হাসিনার পরিবার রাজনীতিতে আসবে না; আগে দেওয়া এই বক্তব্যের কথা উল্লেখ করে সজীব ওয়াজেদ বলেন, ‘আমাদের নেতা-কর্মীদের ওপর যেভাবে হামলা হচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে আমরা হাল ছেড়ে দিতে পারি না। বাংলাদেশে যদি গণতন্ত্রের নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হয়, আওয়ামী লীগ ছাড়া সম্ভব নয়। আওয়ামী লীগ হচ্ছে সবচেয়ে বড় দল। আওয়ামী লীগ কোথাও যাবে না। আওয়ামী লীগকে শেষ করা সম্ভব নয়।’

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে সজীব ওয়াজেদ বলেন, ‘আমি সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি। আপনারা সবাই সাহস নিয়ে দাঁড়ান, আমরা আছি। বঙ্গবন্ধুর পরিবার কোথাও যায়নি। আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি। দেশকে, আমাদের নেতা-কর্মীদের এবং আওয়ামী লীগকে রক্ষা করার জন্য যা প্রয়োজন আমরা করতে প্রস্তুত।’

বর্তমানে ক্ষমতাসীনদের উদ্দেশে সজীব ওয়াজেদ বলেন, ‘এই যে আমাদের বর্তমানে যারাই আছেন ক্ষমতায় তাঁদের আমি বলব, আমরাও একটি গণতান্ত্রিক, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ দেশ চাই, জঙ্গিবাদ মুক্ত। তার জন্য আমরা সবার সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত। শুধু তারা যদি জঙ্গিবাদ, হিংসা বাদ দেন। শেখ হাসিনা মরে যাননি। আমরা কোথাও যাইনি। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ছাড়া গণতন্ত্র, নির্বাচন সম্ভব না।’

বঙ্গবন্ধু

নির্মলেন্দু গুণ

‘‘তোমার ছেলেরা মরে গেছে প্রতিরোধের প্রথম পর্যায়ে,
তারপর গেছে তোমার পুত্রবধূদের হাতের মেহেদী রঙ,
তারপর তোমার জন্মসহোদর, ভাই শেখ নাসের,
তারপর গেছেন তোমার প্রিয়তমা বাল্যবিবাহিতা পত্নী,
আমাদের নির্যাতিতা মা।

এরই ফাঁকে একসময় ঝরে গেছে তোমার বাড়ির
সেই গরবিনী কাজের মেয়েটি, বকুল।
এরই ফাঁকে একসময় প্রতিবাদে দেয়াল থেকে
খসে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের দরবেশ মার্কা ছবি।
এরই ফাঁকে একসময় সংবিধানের পাতা থেকে
মুছে গেছে দু’টি স্তম্ভ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র।

এরই ফাঁকে একসময় তোমার গৃহের প্রহরীদের মধ্যে মরেছে
দু’জন প্রতিবাদী, কর্ণেল জামিল ও নাম না-জানা এক তরুণ,
যাঁরা জীবনের বিনিময়ে তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলো।

তুমি কামান আর মৃত্যুর গর্জনে উঠে বসেছো বিছানায়,
তোমার সেই কালো ফ্রেমের চশমা পরেছো চোখে,
লুঙ্গির উপর সাদা ফিনফিনে ৭ই মার্চের পাঞ্জাবী,
মুখে কালো পাইপ, তারপর হেঁটে গেছো বিভিন্ন কোঠায়।
সারি সারি মৃতদেহগুলি তোমার কি তখন খুব অচেনা
ঠেকেছিলো?
তোমার রাসেল?
তোমার প্রিয়তম পত্নীর সেই গুলিবিদ্ধ গ্রীবা?
তোমার মেহেদীমাখা পুত্রবধুদের মুজিবাশ্রিত করতল?
রবীন্দ্রনাথের ভূলুণ্ঠিত ছবি?
তোমার সোনার বাংলা?

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামবার আগে তুমি শেষবারের মতো
পাপস্পর্শহীন সংবিধানের পাতা উল্টিয়েছো,
বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে
মেখেছো কপালে, ঐ তো তোমার কপালে আমাদের হয়ে
পৃথিবীর দেয়া মাটির ফোঁটার শেষ-তিলক, হায়!
তোমার পা একবারও টেলে উঠলো না, চোখ কাঁপলো না।
তোমার বুক প্রসারিত হলো অভ্যুত্থানের গুলির
অপচয় বন্ধ করতে,
কেননা তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য
একজন কৃষকের এক বেলার অন্নের চেয়ে বেশি।
কেননা তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য একজন
শ্রমিকের এক বেলার সিনেমা দেখার আনন্দের চেয়ে বেশি।
মূল্যহীন শুধু তোমার জীবন, শুধু তোমার জীবন, পিতা।
তুমি হাত উঁচু করে দাঁড়ালে, বুক প্রসারিত করে কী আশ্চর্য
আহবান জানালে আমাদের। আর আমরা তখন?
আর আমরা তখন রুটিন মাফিক ট্রিগার টিপলাম।
তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করে হাজার হাজার পাখির ঝাঁক
পাখা মেলে উড়ে গেলো বেহেশতের দিকে।
তারপর ডেডস্টপ।

তোমার নিষ্প্রাণ দেহখানি সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে, গড়াতে,
গড়াতে, গড়াতে
আমাদের পায়ের তলায় এসে হুমড়ি খেয়ে থামলো।
, কিন্তু তোমার রক্তস্রোত থামলো না।
সিঁড়ি ডিঙিয়ে, বারান্দার মেঝে গড়িয়ে সেই রক্ত,
সেই লাল টকটকে রক্ত বাংলার দূর্বা ছোঁয়ার আগেই
আমাদের কর্ণেল সৈন্যদের ফিরে যাবার বাঁশি বাজালেন।!’’

ভূইঁয়া সফিকুল হক ঃ বড় আমলা ছিলেন। হাসিনার কারণে পদ হারান।

আওয়ামী লীগ লুটপাট করেছে স্বৈরশাষণ করেছে-একমত।
বিএনপি কি একই কাজ করে নি?
জাতীয় পার্টি?
তা হলে এখন স্বাধীনতার সব স্মারক ভাঙছেন কেন?
শহীদ বুদ্ধিজীবীদের দেয়ালচিত্র ভাঙছেন কেন?
জয়নুলের মতো বিশ্ববিশ্রুত মানবদরদী শিল্পীর ভাস্কর্য ভাঙছেন কেন?
রবীন্দ্রনাথের মতো অদ্বিতীয় বিশ্বমনীষীর স্মারক ভাঙছেন কেন?
জাতীর পিতার ছবিতে পেচ্ছাপ করছেন, ভাস্কর্য গুড়াচ্ছেন, কেন?

পরের পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দেখুন

এগুলোতো একাত্তুরের পাকবাহিনীর কাজ। আপনারা কি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে মাঠে নেমেছেন?

যদি তাই হয় ধুলায় ছুড়ে দিন আমার শহীদের বুকের রক্তে আনা পতাকা। উড়ান সেই পুরানো চাঁদতারা।

আমরা শহীদদের কবরে যাবো, সতীত্ব হারানো দুই লক্ষ মা বোনের কবরে যাবো। কেঁদে কেঁদে বলে আসবো, শহীদ ভাইয়েরা, মায়েরা, বোনেরা, ক্ষমা করো, আমরা স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারিনি। আবার পাকিস্তানিরা দেশ দখল করে নিয়েছে।

আপনাদের অবস্থান পরিষ্কার করেন। সমস্যা নেই, আপনাদের মেনে নেব, কারণ আপনারা মেধাবী।

উল্লাসের চিৎকার এবং সজোর হাততালিতে কারও স্বপ্ন ভেঙে না দিই!

দ্রুবা আহসান

স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় রাহুল আনন্দকে। আমার প্রিয় এক মানুষ, তার সৃষ্টি ও গান ভাবনার জন্য, আমি কি পরিমাণ কস্ট পেয়েছি আরও অনেক ঘটনার মত বার বার মনে হয়েছে আগেই কি ভালো ছিলো... ?

সন্তান হারানোর শোক সামলানো যেমন কঠিন, সৃষ্টি হারানোর কস্টও একই, যা কোন ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

জলের গানের দলনেতা রাহুল আনন্দের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সোমবার (৫ আগস্ট) তাঁর বাড়িতে থাকা সহস্রাধিক যন্ত্র ভাঙচুর করা হয়েছে। এটি শুধু রাহুল আনন্দের বসতবাড়ি ছিল না, ব্যান্ডের অনেক গান লেখা থেকে সুর হয়েছে এ বাড়িতে। গানের অফিশিয়াল স্টুডিও হিসেবেও ব্যবহৃত হতো বাড়িটি। দলের সবার দলগত সংগীতচর্চা থেকে শুরু করে সব স্টুডিও ওয়ার্ক-রেকর্ডিং, মিক্সিং, এডিটিং এখানেই হতো।

বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সব সময় সক্রিয় দেখা গেছে রাহুল ও তাঁর দলকে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সংহতি জানিয়েও নিজের দলের সদস্যদের নিয়ে রাজধানীর রবীন্দ্রসরোবরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। এর পরও তছনছ করা হয়েছে তাঁর বাড়ি।

দলনেতা ও ভোকাল রাহুল আনন্দের বাড়িতে হামলার বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছে জলের গান। বিবৃতির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে একটি গান। এই বাড়িতে রেকর্ড করা শেষ গান।

অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ব্যান্ডটি লিখেছে, 'জলের গানের ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের এই বাড়িটি শুধু রাহুল আনন্দের বসতবাড়ি ছিল না; ছিল পুরো দলটির স্বপ্নধাম, আনন্দপুর। যেখানে তৈরি হয়েছে কত গান, কত সুর, আর দাদার ভাবনাপ্রসূত শত শত বাদ্যযন্ত্র। শুধু তা-ই নয়। জলের গানের অফিশিয়াল স্টুডিও হিসেবেও ব্যবহৃত হতো বাড়িটি। দলের সকলের দলগত সংগীতচর্চা থেকে শুরু করে, সকল স্টুডিও ওয়ার্ক-রেকর্ডিং, মিক্সিং, এডিটিং এখানেই হতো।'

সাধারণ জীবন যাপন করতেন রাহুল আনন্দ। তাঁর এই বাড়ির দরজা ভক্তদের জন্য সব সময় খোলা ছিল। ব্যান্ডটি লিখেছে, 'যাঁরা নিয়মিত এই বাড়িতে যাতায়াত করতেন, তাঁরা জানেন যে রাহুল আনন্দ ও উর্মিলা শুক্লার বাড়িটির সাদা গেটটি সব সময় খোলাই থাকত। তাতে তালা দেওয়া হতো না। যে কেউ, যে কোনো দরকারে যেন দাদার কাছে পৌঁছোতে পারে, সেই ভাবনায়। আর যাঁরাই দিনের যেকোনো প্রান্তে এই বাড়িতে এসেছেন, সকলেই একটি চিত্রের সাথে খুব পরিচিত, তা হলো রাহুল আনন্দ মাটিতে বসে একটি সিরিশ কাগজ হাতে নিয়ে তাঁর নতুন বাদ্যযন্ত্রের কাঠ ঘষছেন।'

গত বছর রাহুল আনন্দের বাড়িতে এসেছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ। গানে, গল্পে, আড্ডায় রাহুল আনন্দের সঙ্গে কাটিয়েছেন প্রায় ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট। তাঁর বানানো বাদ্যযন্ত্রের প্রশংসা করেছিলেন তিনি। দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে পুড়েছে সেসব বাদ্যযন্ত্র। ব্যান্ডটি লিখেছে, 'জলের গানের বাদ্যযন্ত্র। রাহুল আনন্দের বিরাট ভাবনা ও স্বপ্নের দিকে ধাবমান এক নিরন্তর প্রয়াস।

আমাদের দেশীয় কাঠে তৈরি, আমাদের নিজেদের বাদ্যযন্ত্র। শুধুই কি আমাদের? এই দলের? জলের গানের? না! এই প্রয়াস সকল নবীন মিউজিশিয়ানদের জন্য, যারা বিশ্বাস করবে, আমরাও আমাদের বাপ-দাদার মতো নিজেদের বাদ্যযন্ত্র নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারি! এই প্রয়াস সেই স্বকীয়তার; যার বলে এই দেশের মানুষ গর্বের সাথে বলতে পারে, এই আমাদের নিজেদের বাদ্যযন্ত্রে বেজে ওঠা অনন্য শব্দতরঙ্গ, যা কি না পুরো পৃথিবীর বুকে কেবল এই বাংলাদেশের মাটিতেই ঝনঝন করে বাজে, সুর তোলে, স্বপ্ন দেখায়। যেই স্বপ্নের ঝিলিক সুদূর ফ্রান্স থেকে আরেকজন মিউজিশিয়ানকে আমাদের দেশে টেনে আনে। পুরো পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষের চোখের আলো পড়ে আমাদের এই

পরের পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দেখুন

দেশে। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের এই বাড়িটিতে।'

ব্যান্ডটি আরও লিখেছে, 'তবে কি এই ঠিকানায় আবাস হওয়াটাই কিছু মানুষের এত ক্ষোভের কারণ? এত রাগের বহিঃপ্রকাশ? যারা ইতিমধ্যে সেখানে গিয়েছেন কিংবা ফেসবুকে পোস্ট দেখেছেন, তারা সকলেই খবরটি জানেন। হ্যাঁ!, রাহুল আনন্দ ও উর্মিলা শুক্লার, এবং আমাদের সকলের প্রিয় জলের গানের এই বাড়িটি আর নেই। সব আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তবে সৃষ্টিকর্তার কৃপায় এবং আশীর্বাদে বাড়ির সকল সদস্য নিজের প্রাণ হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন এবং এখন নিরাপদে আছেন। কিন্তু রাহুলদা এবং আমাদের দলের সকল বাদ্যযন্ত্র, গানের নথিপত্র এবং অফিশিয়াল ডকুমেন্টস ছাড়াও দাদার পরিবারের খাট-পালং, আলনা আর যাবতীয় সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে! সব!'

স্ত্রী উর্মিলা শুক্লা ও ১৩ বছরের পুত্রকে নিয়ে এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বের হতে হয়েছে রাহুলকে। ব্যান্ডটি লিখেছে, 'সকলের জন্য নিরন্তর ভেবে যাওয়া মানুষটিকে পরিবারসহ এক কাপড়ে তাঁর নিজ ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এর প্রভাব হয়তো আজীবন লালিত থাকবে তাঁর সন্তানের মনে; যার বয়স কি না মাত্র ১৩ বছর;ভাবতেই কষ্ট হয়। এত দিন ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্ন সংসারের সবকিছু দাউদাউ করে জ্বলেছে চোখের সামনে। কিছু মানুষের ক্রোধ এবং প্রতিহিংসার আগুনে!'

বিবৃতিতে সবার উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে ব্যান্ডটি লিখেছে, 'এই বাদ্যযন্ত্র, গান বা সাজানো সংসার হয়তো আমরা দীর্ঘ সময় নিয়ে আবার গড়ে নিতে পারব। কিন্তু এই ক্রোধ আর প্রতিহিংসার আগুনকে নেভাব কীভাবে! কেন আমরা ভালোবাসা আর প্রেম দিয়ে সবকিছু জয় করে নিতে পারি না? যেই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখি, সেই স্বাধীনতার রক্ষায় যদি একইভাবে এগিয়ে আসতে ব্যর্থ হই, তাহলে চরম নিরাশা, অপমান ও লজ্জায় নিজেদের গানই গেয়ে উঠি এক ভগ্ন হৃদয়ে, 'কোন্ ছোবলে স্বপ্ন আমার হলো সাদা কালো? আমার বসত অন্ধকারে; তোরা থাকিস ভালো!'

সবশেষ ব্যান্ডটি লিখেছে, 'সকল প্রাণ ভালো থাকুক। নতুন আগামীর স্বপ্নকে আমরাও অভিবাদন জানাই একইভাবে। কিন্তু নিজের উল্লাসের চিৎকার এবং সজোর হাততালিতে কারও স্বপ্ন ভেঙে না দিই!'

-প্রথম আলো; ৬ আগস্ট

উদীচীর সংস্কৃতিকর্মী সমাবেশ সহিংসতাকারীদের শাস্তি দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ ঐতিহ্যবাহী ভাস্কর্য, শিল্প, শিল্পাঙ্গন ধ্বংসসহ সব ধরনের সহিংসতার প্রতিবাদ জানিয়ে সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। আজ শুক্রবার সকালে রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সংস্কৃতিকর্মী সমাবেশ থেকে এ দাবি জানায় সংগঠনটি।

দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক হামলা ও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, ডাকাতি, হত্যাকাণ্ড প্রতিহত করা এবং জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, গণতান্ত্রিক দেশ গড়ার আহ্বানও জানানো হয় এই সংস্কৃতিকর্মী সমাবেশে। পাশাপাশি ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনে অর্জিত অভূতপূর্ব বিজয় যেন হাতছাড়া না হয়, এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়।সমাবেশে উদীচীর সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে বলেন, ছাত্র-জনতা বিজয়ের পর থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে ধারাবাহিকভাবে সাম্প্রদায়িক হামলা, সংখ্যালঘু নির্যাতন, ডাকাতি, হত্যাকাণ্ড এবং ঐতিহ্যবাহী ভাস্কর্য-শিল্প-শিল্পাঙ্গন ধ্বংসের ঘটনা ঘটে চলেছে। এসব হামলার প্রত্যক্ষ শিকার হচ্ছেন ধর্মীয়ভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁদের উপাসনালয়, বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে নির্বিচারে হামলা-লুটপাট চালানো হচ্ছে। নতুন সরকারকে অবিলম্বে সব ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ করে এসব ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি অধ্যাপক বদিউর রহমান। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা পদত্যাগের পর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধু জাদুঘরসহ মুক্তিযুদ্ধের নানা ঐতিহাসিক নিদর্শনের সংগ্রহশালা। ভাঙচুর করা হয়েছে বাংলা একাডেমি চত্বরে মুক্তিযুদ্ধের সাত বীরশ্রেষ্ঠর ম্যুরাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাস্কর্য চত্বর। হামলা হয়েছে শিশু একাডেমি ও কুড়িগ্রামের শিল্পকলা ভবনে। খুলনায় গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ আর্কাইভ। দেশে এমন অস্থির সময় আগেও এসেছে। গভীর অন্ধকার থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংস্কৃতির শক্তিতে নতুন জাতীয় উজ্জীবন ঘটাতে হবে বলেও মনে

করেন তিনি।

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন সংগঠনটির সহসভাপতি হাবিবুল আলম, প্রবীর সরদার, জামসেদ আনোয়ার, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরের সাধারণ সম্পাদক প্রণয় সাহা ও যুব ইউনিয়নের সভাপতি খান আসাদুজ্জামান।

এই সমাবেশে সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন উদীচীর সংগীত বিভাগের শিল্পীরা। একক সংগীত পরিবেশন করেন সুরাইয়া পারভীন, বুলবুল ইসলাম, সাজেদা বেগম।

- প্রথম আলো, ০৯ আগস্ট ২০২৪

হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, সাম্প্রদায়িকতা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিলন দত্ত

১৯২২ সাল। কালিদাস নাগ বিলেত থেকে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন, 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কি ?চিঠির জবাবে কবি লিখলেন 'খিলাফত উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে, হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি। আচার হচ্ছে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে।...অন্য আচার অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মত মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছুতেই নেই।' চিঠির শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসবো।'

মুসলমানের বৈশিষ্ট্য ও ভারতবর্ষে তাদের অধিকার হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধে লইয়া আমাদের দেশে একটা পাপ আছে। এ পাপ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইবার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোন মতেই নিস্তার নাই।'

১৩১৪ সনে কবি 'প্রবাসী'তে লিখছেন, 'আমরা এক দেশে এক সুখদুঃখের মধ্যে একত্রে বাস করি, আমরা মানুষ, যদি এক না হই তবে সে লজ্জা, সে অধর্ম।' ওই বছরই পাবনায় ভারতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণে বলছেন, 'এদিকে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়্গ দেশের মাথার উপর ঝুলিতেছে । কত শত বৎসর হইয়া গেল, আমরা হিন্দু ও মুসলমান একই দেশমাতার দুই জানুর উপরে বসিয়া একই স্নেহ ভোগ করিতেছি। তথাপি আজও আমাদের মিলনে বিঘ্ন ঘটিতেছে।' একশো বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেল কবির এই আক্ষেপ, এই চেতাবনি। তথাপি মনে হয় নাকি, আজকের সাম্প্রদায়িক সংঘাতের এই দুঃসময়ে যেন কবি সতর্ক করছেন আমাদের !

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি কি করা যায়, শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রী হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখি না। যদি বা শাস্তির বিধানই হয়, তবে সে অস্ত্র লইয়া স্বদেশ-জাতি-স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে পানি খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে আপন করিয়া যাহাদের জাতি রক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি সহ্য করিতে হইবে।'

হিন্দুরা মুসলমানদের ব্যাপারে যে মনোভাব পোষণ করতো তা কবিকে ব্যথিত করেছিল। তার জন্য তিনি হিন্দু সম্প্রদায়কেই প্রধানত দায়ী করেন। কিশোর বয়সের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে বলেন, '...আমি হিন্দুর তরফ হইতে বলছি, মুসলমানের ত্রুটি বিচারটা থাক; আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সেজন্যে যেন লজ্জা স্বীকার করি। অল্পবয়সে যখন প্রথম জমিদারি সেরেস্তা দেখতে গিয়েছিলুম তখন দেখলুম, আমাদের ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে-তক্তাপোশের গদিতে বসে দরবার করেন সেখানে একধারে জাজিম তোলা, সেটা মুসলমান প্রজাদের বসবার জন্য; আর জাজিমের উপর বসে হিন্দু প্রজারা। এইটা দেখে আমার ধিক্কার জন্মেছিল।'

১৯২০-২১ সালে সালে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে মাওলানা মহম্মদ আলী ও গান্ধীজীর নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমানের পুনর্মিলনের একটা উদ্যোগ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ বুধেছিলেন,এ মিলন স্থায়ী হবে না। 'সমস্যা' নামে একটি প্রবন্ধে কবি লিখেন, 'প্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। তার সমাধান এত দুঃসাধ্য, কারণ দুই পক্ষই মূলত আপন আপন ধর্মের দ্বারাই অচলভাবে আপনাদের সীমা নির্দেশ করেছে। সেই ধর্মই আমাদের মানববিশ্বাসকে সাদাকালো ছক কেটে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করেছে; আত্ম ও পর। সংসারে সর্বত্রই আত্মপরের মধ্যে কিছু পরিমাণ স্বাভাবিক ভেদ আছে। সেই ভেদের পরিমাণটা অতিমাত্রায় হলেই তাতে

অকল্যাণ হয়।' ১৩৩৯ সনে প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত ওই প্রবন্ধেই কবি বললেন, 'ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই হিন্দু মুসলমানের কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালওয়ানি ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয় পক্ষের সামাজিক সমকক্ষতা!' ১০০ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে আমাদের আজও সেই কথাই হাওড়াতে হচ্ছে। তবু তা সম্ভব হচ্ছে কই!

সবার অংশগ্রহণে গঠিত যে মহান সভ্যতার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেছেন তার দেহ ও আত্মায় হিন্দু ও মুসলমান এই দু'টি জাতিসত্ত্বার গুরুত্ব ও ভূমিকাই মুখ্য । তিনি মুসলমানের মর্যাদা, অধিকার ও প্রকৃত মূল্যায়নকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং এই দু'টি জাতিসত্ত্বার মিলনকে এত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে জাতির অস্তিত্বের স্বার্থে হিন্দু সমাজকে তা বোঝাতে চেয়েছেন। এখানেও তাঁর ভাষাতেই বলা যায়, 'এ দিকে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়্গ মাথার উপর ঝুলিতেছে। এই দুর্বলতার কারণ যতদিন আছে ততদিন আমাদের দেশের কোন মহৎ আশাকে সম্পূর্ণ সফল করা সম্ভব হইবে না খআমরা (হিন্দু) গোড়া হইতে ইংরেজদের স্কুলে বেশি মনোযোগের সাথে পড়া মুখস্ত করিয়াছি বলিয়া গভর্নমেন্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িআছে সন্দেহ নেই। এই টুকু ('পার্থক্য') কোন মতে না মিটিয়া গেলে আমাদের মনের মিলন হইবে না।'

রবীন্দ্রনাথ আরও জানালেন 'আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোন প্রমাণ দিই নাই। অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ করলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। খআমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোকে জানে না এবং আমাদের মনের মধ্যেও সে যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ভাব অত্যন্ত জাগরুক; আমাদের ব্যবহারে এখনো তাহার কোনো প্রমাণ নাই।'

আজ আমাদের দেশে এবং বিশেষত রাজ্যে যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা যথেষ্ট উদ্যোগের। বারবার কেন ঘুরে ফিরে আসে এই দুঃসময়। গত কয়েক বছরে এ রাজ্যে যুযুধান রাজনৈতিক মত প্রতিষ্ঠার তাগিদে তারা ধর্ম নিয়ে যে খেলা শুরু করেছে তারই পরিণতিতে এই পরিস্থিতি। সাধারণ মানুষকে তার যে কি ফল ভুগতে হয়, আপনাদের চেয়ে ভালো আর কে জানে!

মুসলমানদের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তার অনুভব ব্যক্ত করেছেন এ ভাবে, 'স্বদেশীযুগে আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরে আত্মীয় বলিয়া, ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম। সেই স্নেহের ডাকে যখন তারা অশ্রু গদগদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারী রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই, আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না...। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সাথে সাথে এক হয় নাই তাহার কারণ তাদের সাথে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।'

তাঁর মুসলমানকে কাছ থেকে দেখা এবং তাঁদের জানা পূর্ববঙ্গে জমিদারি সামলাতে গিয়ে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমিদারি দেখাশোনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে মুসলমান প্রজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতে হয়েছে। তিনি সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে, 'আমার অধিকাংশ প্রজাইমুসলমান। কুরবানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু যারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সংগত মনে করিনি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলেদিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে তারা তখনই তা মেনে নিল। আমাদের সেখানে এ পর্যন্ত কোনো উপদ্রব ঘটেনি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ, আমার সঙ্গে আমার মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন। একথা আশা করাই চলে না যে, আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে ধর্মকর্মের মতবিশ্বাসের ভেদ একেবারেই ঘুচতে পারে। মনুষ্যত্বের খাতিরে আশা করতেই হবে, আমাদের মধ্যেমিল হবে।'

হিন্দু মুসলমানের বিরোধ তাঁকে সবসময়েই ব্যথিত করেছে।ওই সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজেছেন জীবনভর।১৯৩১ সালের ৯ মে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরে দেখছি কবি বলছেন, 'যতদিন পর্যন্ত হিন্দু কিংবা মুসলমানের মধ্যে কোন একটি সম্প্রদায় অথবা উভয় সম্প্রদায়ের দীর্ঘ ভ্রাতৃবিরোধী সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, কিংবা শিক্ষার ফলে তাহাদের মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি সম্পন্ন পরিবর্তন সাধিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত আমি ঐ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের কোন লক্ষণ

দেখি না।'

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই মনে করতেন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দূর হতে পারে মেলামেশা চেনাজানার মধ্যে দিয়ে। সেটাই একমাত্র পথ। এই পাঠ শেষ করব কবির বিশ্বভারতী পরিষদে ১৩৩২ সনে বক্তৃতার একটি উক্তি দিয়ে, 'যে অন্ধকারে ভারতবর্ষে আমরা পরস্পরকে ভালো দেখতে পাইনে সেইটাই আমাদের সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। ...ভারতবর্ষের সেই রাত্রি চিরন্তন হয়ে রয়েছে। মুসলমান বলতে কী বোঝায় তা সম্পূর্ণ করে আপনার করে অর্থাৎ রামমোহন রায় যেমন করে জানতেন, তা খুব অল্প হিন্দুই জানেন। হিন্দু বলতে কী বোঝায় তাও বড়ো করে আপনার করে, দারাশিকো একদিন যেমন করে বুঝেছিলেন, অল্প মুসলমানই জানেন। অথচ এই রকম গভীর ভাবে জানার ভিতরেই পরস্পরের ভেদ ঘোচে।'

আজও আমরা সে দিকেই চেয়ে থাকি কবে হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে সম্পূর্ণ করে জানবে, মিথ্যা রেষারেষি হিংসা বিদ্বেষ দূর হবে। তাঁর দেখানো পথেই হাঁটতে চেষ্টা করি। আশায় থাকি, শান্তিকল্যাণ হবে সমাজ সংসার।

নাগরিক স্মৃতিচারণা ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর মহানুভবতা সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শিবনাথ শাস্ত্রী

নারায়ণ দেব

বিদ্যাসাগরের কর্মাটাঁড়ে বাসকালীন সেখানে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে কিছু অজানা কাহিনীর কথা বলা হচ্ছে।

কর্মাটাঁড় বিহারের জামতাড়া ও মধুপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী একটি স্টেশন যার পাশেই ১৮৭৮ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপরে বাগানসহ একটি বাংলো নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেই বাংলোয় দুটি হল, চারটি ঘর ও দুটি বারান্দা ছিল। শরীর মন একটু খারাপ হলেই তিনি কোলকাতা থেকে সেখানে গিয়ে বাস করতেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লখনউ কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করতে যাবার পথে কর্মাটাঁড়ে ব্রেক জার্নি করে বিদ্যাসাগরের বাংলোতে তাঁর অতিথি হিসেবে দুটো দিন কাটান। তিনি বিদ্যাসাগরের উষ্ণ সান্নিধ্যে স্বল্প সময়ের সেই অবস্থানের অভিজ্ঞতা পরবর্তী সময়ে তাঁর *'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ'* শীর্ষক নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেই লেখা থেকে বিদ্যাসাগর সেখানকার গরীব সাঁওতাল অধিবাসীদের কিভাবে সেবা ও সাহায্য করতেন তার কথা নীচে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি।

'সকালে রৌদ্র উঠিতে না উঠিতেই এক জন সাঁওতাল গোটা পাঁচ ছয় ভুট্টা লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল, ও বিদ্যেসাগর,আমার পাঁচ গণ্ডা পয়সা না হইলে আমার ছেলেটার চিকিৎসা হইবে না; তুই আমার এই ভুট্টা কটা নিয়া আমায় পাঁচ গণ্ডা পয়সা দে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ পাঁচ আনা পয়সা দিয়া সেই ভুট্টা কটা লইলেন ও নিজের হাতে তা তাকে তুলিয়া রাখিলেন। তারপর আর একজন সাঁওতাল, তার বাজরায় অনেক ভুট্টা; সে বলিল- আমার আট গণ্ডা পয়সার দরকার। বিদ্যাসাগর মহাশয় আটগণ্ডা পয়সা দিয়াই তাহার বাজরাটি কিনিয়া লইলেন। আমি বলিলাম- বাঃ, এ তো বড় আশ্চর্য! খরিদ্দার দর করে না, দর করে যে বেচে। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিলেন। তারপর দেখি- যে যত ভুট্টা আনিতেছে, আর যে যত দাম চাহিতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দামে ভুট্টাগুলি কিনিতেছেন আর তাকে রাখিতেছেন। আটটার মধ্যে চারিদিকের তাক ভরিয়া গেল, অথচ ভুট্টা কেনার কামাই নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- এত ভুট্টা লইয়া আপনি কি করিবেন? তিনি বলিলেন- দেখবি রে দেখবি।'

ভুট্টা কেনা চলিতে লাগিল। একটু অন্য কাজে গিয়াছি, আসিয়া দেখি, বিদ্যাসাগর ঘরে নাই। বাহিরে আসিয়া পথে দেখি, ... বিদ্যাসাগর মহাশয় হনহন করিয়া আসিতেছেন, দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতেছে, হাতে একটা পাথরের বাটি। আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- তুই এখানে কেন? আমি বলিলাম- আপনাকে খুঁজিতেছি, কোথায় গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, খানিকক্ষণ আগে একটা সাঁওতালনি আসিয়াছিল, সে বলিল- বিদ্যাসাগর, আমার ছেলেটার নাক দিয়ে হু হু করে রক্ত পড়ছে, তুই এসে যদি বাঁচাস। তাই আমি একটা ওষুধ এই বাটি করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আশ্চর্য, দেখিলাম- এক ডোজ ওষুধে তার রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া গেল। ইহারা তো মেলা ওষুধ খায় না,এদের অল্প ওষুধেই উপকার হয়, কলিকাতার লোকের ওষুধ খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়িয়া গিয়াছে, মেলা ওষুধ না দিলে তাদের উপকার হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কতদূর গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, 'ওই যে গাঁ-টা দেখা যাচ্ছে,

মাইল দেড়েক হবে।' আমি পূর্ব হইতেই জানিতাম, বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব হাঁটিতে পারিতেন।'

'বাংলোয় আসিয়া চাহিয়া দেখি, বাংলোর সম্মুখের উঠান সাঁওতালে ভরিয়া গিয়াছে- পুরুষ মেয়ে ছেলে বুড়ো সব রকমের সাঁওতালই আছে। তারা দল বাঁধিয়া বসিয়া আছে, কোন দলে পাঁচ জন, কোন দলে আট জন, কোন দলে দশ জন। প্রত্যেক দলের মাঝখানে কতকগুলি শুকনা পাতা ও কাঠ। বিদ্যাসাগরকে দেখিয়াই তাহারা বলিয়া উঠিল- ও বিদ্যাসাগর আমাদের খাবার দে। বিদ্যাসাগর ভুট্টা পরিবেশন করিতে বসিলেন। তাহারা সেই কাঠ ও শুকনা পাতায় আগুন দেয়, তাহাতে ভুট্টা সেঁকে, আর খায়,- ভারি ফুর্তি। আবার চাহিয়া লয়- কেহ দুটা, কেহ তিনটা, কেহ চারিটা ভুট্টা খাইয়া ফেলিল। তাকের রাশীকৃত ভুট্টা প্রায় ফুরাইয়া আসিল। তাহারা উঠিয়া বলিল- খুব খাইয়েছিস বিদ্যেসাগর। ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর রকে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, আমিও আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম; ভাবিলাম এ রকম বোধ হয় আর দেখিতে পাইব না।'

বিদ্যাসাগর এই প্রকার নানাভাবে তাঁর কর্মাটাঁড়ে অবস্থানকালে সাঁওতালদের সেবা ও সাহায্য করতেন। তার সম্পর্কে নানা কথা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা থেকেও জানা যায়। বিদ্যাসাগর তাদের 'আমার সাঁওতালরা' এইরূপ বলতেন।

বিদ্যাসাগরের মহানুভবতা মূলক কর্মকাণ্ডের অজস্র ঘটনার কথা অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়, যা ছিল জাতপাত ধর্ম নিরপেক্ষ। একটা ঘটনার কথা শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা থেকে জানাচ্ছি।

একদিন তাঁহার অধ্যয়ন কক্ষে বসিয়া আছি। তিনি কি একটি গ্রন্থ লইয়া গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেছেন। এমন সময় একটি খৃষ্টান বৃদ্ধা রমণী সেখানে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে একটি কাগজ পড়িতে দিল- সম্ভবত উহা আর্থিক সাহায্যের জন্য এক আবেদন পত্র।

পত্রখানি পাঠ করিয়াই তিনি বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বৃদ্ধার দিকে তাকাইয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন- আমার কাছে শুধু শুধু কেন এসেছেন? আপনার স্বজাতির নিকট যান। আমাদের নিজের দেশেই এত দুঃখী রয়েছে যে তাদেরই সমুচিত সাহায্য দিয়ে উঠতে পারিনে। কিন্তু আপনি-

হঠাৎ থামিয়া যাইতেই আমি তাঁহার দিকে তাকাইলাম। দেখি- একদৃষ্টে তিনি বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া আছেন। তারপরই অকস্মাৎ ত্রস্তব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন- আপনি এ অসুস্থ শরীর নিয়ে উপরে উঠেছেন কেন? আপনি নীচে আমার দরওয়ানকে পত্রটি দিলেই পারতেন। আপনাকে কি একটু হাওয়া করতে বলব?-

আগন্তুক নারী তখন হাঁপাইতেছে। তাহার চোখেমুখে রোগ যন্ত্রণার ছাপ। হাতের ইঙ্গিতে সে হাওয়া করিতে নিষেধ করিল। কোন প্রকার বাক্যব্যয় আর না করিয়া বিদ্যাসাগর বৃদ্ধাকে তৎক্ষণাৎ দশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'চারিত্রপূজা' নিবন্ধে লিখেছেন, হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে, করুণার অশ্রুজলপুর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে বিদ্যাসাগর নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগরকে লেখা একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "The man Vidyasagar to whom I have appealed– has the genius and wisdom of an ancient sage – the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother"

অন্যত্র দেখা যায় বিদ্যাসাগর মুসলিম শিশুদের কোলে নিচ্ছেন, মুসলমান পল্লীতে চিকিৎসা করছেন,১৮৬৬ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে সকল জাতি নির্বিশেষে শত সহস্র নিরন্ন আর্ত মানুষের জন্য অন্নের ব্যবস্থা করছেন, নীচজাতীয় স্ত্রীলোকদের রুক্ষ চুলে স্বয়ং তেল মাখিয়ে দিচ্ছেন, শূদ্রের শিক্ষার সপক্ষে কথা বলছেন, দরিদ্র বালকদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় ও রাখাল-স্কুল স্থাপন করেছেন, দরিদ্রবর্গের রোগোপশমের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন ইত্যাদি। এই সবের পিছনে রয়েছে তাঁর এমন একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি যা সম্পূর্ণরূপে ইহজাগতিক, সেকুলার। তাঁকে অজ্ঞেয়বাদী বা বস্তুবাদী বা নাস্তিক কী বলা হবে তা নিয়ে তর্ক চলতেই পারে। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, প্রাতিষ্ঠানিক কোন ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল না। ঈশ্বর/ভগবান/আল্লা ইত্যাদিও ছিল তাঁর কাছে হাসি ঠাট্টার বিষয়, যা নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে কিছু ঘটনা আমরা জানতে পারি। এসব নিয়ে চিন্তা করা তাঁর কাছে ছিল অর্থহীন ও সময়ের অপচয়। তাঁর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ছিল মানবকেন্দ্রিক। দেখা যায়, মানুষই তাঁর প্রথম ও শেষ কথা। মানুষই ছিল তাঁর কাছে সব। বস্তুত, ঈশ্বরের কোন 'ঈশ্বর' ছিল না।

‘আমরা বিজ্ঞানী ভিখারি নই’: সম্মুখ সমরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস বনাম কেন্দ্রীয় সরকার

সৌম্য পিল্লাই

গত ১এপ্রিল , ২০২৪ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস (ISCA)-এর নবনির্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক গৌতম পাল কর্মভার গ্রহণ করার প্রথম দিনেই এক যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন। কলকাতার পার্কসার্কাসে সংস্থার কেন্দ্রীয় অফিসে ঢুকতে গিয়ে তিনি দেখলেন সেটি তালাবন্ধ ও সিল করা। তার পর থেকেই ভারত সরকার ও ১১০ বছরের পুরোনো এই সংস্থার মধ্যে সংঘাত বেড়েই চলেছে। একদিকে সংস্থার বর্তমান কর্মকর্তারা দাবি করছেন এটা স্বশাসিত সংস্থার কাজকর্মের উপরে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে লড়াই , অন্য দিকে কেন্দ্রের অভিযোগ সরকারি টাকার নয়ছয় ও স্বজন পোষণ চলছে ওখানে। লড়াই এখন কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন। অধ্যাপক পাল, যিনি একজন নামী শারীরতত্ত্ববিদ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-উপাচার্য ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি এখনও তাঁর দপ্তরে বসতে পারছে না। ভারত সরকার ISCA -র নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কাউন্সিলকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর, যেটি ISCA কে আর্থিক সাহায্য দেয়, এক নির্দেশিকায় দেশের সমস্ত নামী বিজ্ঞান সংস্থা, যেমন AIMS – JIPMER – INSA ইত্যাদিকে তাদের কমিটিতে ISCA র কোনো প্রতিনিধিকে রাখতে বারণ করে দিয়েছে।

আজ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের একটি প্রতিষ্ঠান, যার শীর্ষপদ সি ভি রমন, শান্তি স্বরূপ ভাটনগর, এ এল মুদালিয়ার, হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার মতো মানুষ অলংকৃত করেছেন, সেটি তার স্বশাসনের অধিকার বজায় রাখার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। সেই সাথে কেন্দ্র আর ISCA র এই খেয়োখেয়িতে বিজ্ঞান সমাজ হারাতে বসেছে বিজ্ঞান বিষয়ক আলাপ আলোচনা করার, নতুন ভাবনার বিকাশ ও নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার একটি প্লাটফর্ম - যেটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরাধীন ভারতে ১৯১৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংঘাতের সূত্রপাত হয় এ বছরের জানুয়ারী মাসে যখন সংস্থার বার্ষিক কনফারেন্স, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস বাতিল করা হয়। এই সিদ্ধান্ত খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল। এর আগে এ পর্য্যন্ত মাত্র দুবার, ২০২০ ও ২০২১ সালে, বিজ্ঞান কংগ্রেস আয়োজন করা যায় নি করোনার জন্য। প্রতি বছর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর SDSTV ISCA কে ৫ কোটি টাকার মত অনুদান দেয় , যা মূলতঃ ব্যয় হয় জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস আয়োজন করার জন্য। বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-উৎসাহীদের নিয়ে প্রতি বছর জানুয়ারির ৩ থেকে ৭ তারিখ - এই পাঁচ দিন এই বিজ্ঞানের আসর বসে, যার উদ্বোধন করেন স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী। শেষ বিজ্ঞান কংগ্রেস বসেছিল ২০২৩ সালে নাগপুরে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়ালি এর উদ্বোধন করেন।

DST র এক উর্ধতন আধিকারিকের বক্তব্য অনুযায়ী জ্জ(ঙ্খঙ র সাথে গত এক বছর ধরে চলতে থাকা মতবিরোধ চূড়ান্ত রূপ নেয় এ বছরের বিজ্ঞান কংগ্রেস বাতিল হওয়ার মধ্যে দিয়ে। তার কথায় ISCA স্বায়ত্তশাসনের নাম করে সরকারি অনুদানের নয়ছয় করছে, এটা প্রথম নজরে আসে ২০২১ সালে। এই অনুদান দেওয়া হয় মূলতঃ বিজ্ঞান কংগ্রেস আয়োজন করতে ও কর্মচারীদের বেতন দিতে। কিন্তু, ISCA তার অপব্যবহার করছে। খরচের হিসাব দেবার ব্যাপারে অস্বচ্ছতা, ফেলোশিপ দেবার ব্যাপারে স্বজনপোষণ ইত্যাদি ISCA র কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ। ১৩ ই মে ২০২৪ এ এক নির্দেশনামায় DST ISCA পরিচালিত সমস্ত রকমের অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। শুধু তাই নয় , আর্থিক অনিয়ম ও টাকা পয়সার নয়ছয় তদন্ত করতে একটি ভিজিলেন্স কমিটি গঠন করে। এদের আরও বক্তব্য, গত কয়েকবছরে বিজ্ঞান কংগ্রেস তার গুরুত্ব হারিয়েছে। কোনো নামী বিজ্ঞানী আজকাল আর বিজ্ঞান কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করতে বা কোনো ভাবে যুক্ত হতে চায় না।

অপরদিকে ISCA র বিজ্ঞানীদের চোখে এই নির্দেশ সংস্থার স্বায়ত্ত্বশাসনের উপর সরকারের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ ও দাদাগিরির অন্যতম নিদর্শন। তসংস্থার আয়ব্যয়ের হিসাবপত্র জনগণের সম্পত্তি এবং প্রতি বছর সংসদের কাছে তা পেশ করা হয়। সরকার যদি তার মধ্যে আর্থিক অনিয়মের খোঁজ পায় তবে এব্যাপারে তারা লিখিত ব্যাখ্যা চাইতেই পারে। কিন্তু তা চাওয়া হয় নিদ, ISCA র গতবারের সভাপতি অধ্যাপক অরবিন্দ কুমার সাক্সেনার মন্তব্য। ২০২২ সালে DST

ISCA র কাজকর্মের মধ্যে স্বচ্ছতা আনতে তার নিয়মকানুনের পরিবর্তন আনতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু সংস্থার কার্য্যনির্বাহী সমিতি তা নাকচ করে দেয়। "ISCA একটি স্বশাসিত সংস্থা, এবং তার নিজস্ব নিয়মকানুন আছে। এগুলি রাতারাতি পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু DST তার ইচ্ছেমত সংস্থার নিয়মকানুন পাল্টানোর জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছেদ সাক্সেনা বলেন। ২০২৪ সালের বিজ্ঞান কংগ্রেস শুরুর মুখে গত বছর নভেম্বরে ISCA তার স্বাধিকার রক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কলকাতা হাইকোর্টে এক রিট পিটিশন দায়ের করে।

সংস্থার নবনির্বাচিত কাউন্সিলও তার স্বায়ত্তশাসন বিসর্জন দিয়ে কেন্দ্রের কথামত চলতে রাজি নয়। তসংস্থার স্বাধিকার বজায় রাখার জন্য শেষ অবধি লড়াই করে যাব।বর্তমান সভাপতি শ্রী পালের বক্তব্য, সরকার তার অনুদান বন্ধ করে দিতে পারে, কিন্তু আমরা সংস্থার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে তুলে দেব না। আমরা বিজ্ঞানী, ভিখারি নই ত।এইভাবে ISCA এখন সম্মান, অর্থ এবং স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য মাটি কামড়ে লড়াই করে যাচ্ছে। উল্লেক্ষ্য, এই সংস্থাকেই আবার কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত সেরা বিজ্ঞানীরা তছদ্মবিজ্ঞানদ চর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য কাঠগড়ায় তুলেছেন। সেই সংস্থাই গত এক বছর হল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুখোমুখি।

সভাপতি পালের কথায়, "ISCA র কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে আনবার নানারকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পরে সরকার এবছর জানুয়ারিতে যে বিজ্ঞান কংগ্রেস হবার কথা সেটি কোথায় হবে তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। দুটি বিশ্ববিদ্যালয় যারা আগে এই কর্মকান্ড আয়োজন করতে সম্মত হয়েছিল তারা শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে যায়। প্রথমে আমরা লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কথা বলে সেই চত্বরেই অনুষ্ঠান হবে বলে ঘোষণা করি। কিন্তু পরে তারা কোর্টে আমাদের রিট পিটিশনের অজুহাত দেখিয়ে পিছিয়ে যায়। তারপর আমরা এটিকে লাভলী প্রফেশনাল বিশ্ববিদ্যালয়, একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরিয়ে নিয়ে যাই। কিন্তু অনুষ্ঠানের কয়েক সপ্তাহ আগে তারা এব্যাপারে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেদ।

তবে ISCA র অন্দরমহলের সবাই কর্তৃপক্ষের এই রনংদেহী মনোভাব ভালো চোখে নেয় নি। তাদের বক্তব্য, বছরের পর বছর কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছেন ও নানা ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছেন। সংস্থার কার্যনির্বাহী সম্পাদক অতুল কুমারের মতে, সংস্থার একটি মাত্র অংশ সরকারের বিরুদ্ধে কোর্টে গিয়েছে। যদিও তারা দাবি করে তারাই সংস্থার বৈধ প্রতিনিধি, বেশিরভাগ সদস্যই কিন্তু মনে করে এর পরিচালনায় আরও স্বচ্ছতা আনা প্রয়োজন। ততুমি যদি কারোর কাছ থেকে টাকা নাও, তবে তার হিসেব দিতে তুমি দায়বদ্ধ। ISCA র আয়ের ৯৯ শতাংশ আসে DST থেকে, আমাদের আয়ের আর কোনো উৎস নেই.দ, অতুল কুমার বলেন। অপরদিকে কিছু সদস্যের মত, যদি প্রয়োজন হয়, তবে ISCA কে DST র সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে, কিন্তু তার স্বায়ত্ত্বশাসন নিয়ে কোনো আপস করা চলবে না।

এই টানাপোড়েনের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিজ্ঞান। এর আগেও অনেক নামীদামী বিজ্ঞানী অভিযোগ করেছেন বিজ্ঞান কংগ্রেসে বিজ্ঞান চর্চার নামে ইদানিং অবৈদিক বিজ্ঞানদ চর্চা হচ্ছে। নাম প্রকাশে নারাজ এক বিজ্ঞানীর মতে, ২০১৪ সাল থেকে শতাব্দীপ্রাচীন এই সংস্থার গেরুয়াকরণের প্রক্রিয়া চলছে এবং এটিই বিজ্ঞানের সামনে বড় বিপদ। IISER কলকাতার প্রাক্তন অধিকর্তা অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জীর বলেন, বিজ্ঞান কংগ্রেসে পঠিত গবেষণাপত্র ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার মান ক্রমান্বয়ে নিচে নামছে। তএর ফলে দেশের দেশের সবচেয়ে নামী বিজ্ঞানীরা আজকাল আর এতে অংশগ্রহণ করার তাগিদ অনুভব করেন না। কিছু বিজ্ঞান কংগ্রেসে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে নিয়ে আলোচনা হয়দ।

এর সূত্রপাত হয় ২০১৫ সালের মুম্বাই বিজ্ঞান কংগ্রেসে একটি বিতর্কিত গবেষণাপত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে। পাইলট ট্রেনিং একাডেমির প্রাক্তন প্রিন্সিপাল আনন্দ বোদাস ও অমেয় যাদব, একজন কলেজের লেকচারার, একটি বিতর্কিত গবেষণাপত্র 'প্রাচীন ভারতীয় বিমান পরিবহন প্রযুক্তি' পাঠ করেন। এটা পাঠ করা হয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এক নয়া প্রবর্তিত আলোচনাচক্রে, 'সংস্কৃতের মাধ্যমে প্রাচীন বিজ্ঞান অন্বেষণ'। এর উদ্দেশ্য প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য ঘেঁটে বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার। অনেক বিজ্ঞানীর মতেই এই পরিবর্তনটা বিজেপি সরকার কেন্দ্রে আসার পরে থেকেই শুরু হয়, যদিও এর জন্য কোনো সরকারি নির্দেশ জারি হয় নি। অবশ্য এব্যাপারে গৌতম পাল কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন।

ক্রমশঃ বিকল্প বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা ISCA র প্রতিটি বার্ষিক অধিবেশনে এক প্রথা হয়ে ওঠে। ২০১৯ এর বিজ্ঞান কংগ্রেসে তৎকালীন অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জি নাগেশ্বর রাও দাবি করেন, মহাভারতের কৌরবদের জন্ম হয় স্টেম সেল ও টেস্ট টিউব প্রযুক্তির মাধ্যমে। আর একজন বক্তা ,তামিলনাড়ু ওয়ার্ল্ড কমিউনিটি সার্ভিস সেন্টারের বরিষ্ঠ গবেষক কে জে কৃষ্ণান প্রস্তাব করেন অভিকর্ষ তরঙ্গের নাম হোক 'নরেন্দ্র মোদী তরঙ্গ', আর তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী হর্ষবর্ধনের নামে অভিকর্ষ বলের প্রভাবে আলোর দিক পরিবর্তনকে নাম দেওয়া হোক 'হর্ষবর্ধন এফেক্ট' । বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের ছাত্রদের পক্ষ থেকে এই জাতীয় বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করা হয় । অনেকেই এরপর ISCA র সাথে তাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছেদ করেন। ২০১৬ সালে, বি এম বিড়লা সায়েন্স সেন্টার, হায়দ্রাবাদের প্রাক্তন অধিকর্তা বি জি সিদ্ধার্থ বিজ্ঞান কংগ্রেসকে বিজ্ঞানের কুম্ভমেলা বলে আখ্যা দেন, যেখানে বিজ্ঞানের গুণমান রক্ষার প্রচেষ্টার বদলে স্বজনপোষণই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় বংশদ্ভূত নোবেলজয়ী জীববিজ্ঞানী ভেঙ্কটরামন রামকৃষ্ণানও বিজ্ঞান কংগ্রেসকে একটি তসার্কাসদ বলে আখ্যা দিয়েছেন, যেখানে বিজ্ঞান ছাড়া সব কিছুই আলোচনা হয় ।

ISCA র মতো স্বনামধন্য সংস্থার পক্ষে এটা খুবই দুঃখজনক পরিণতি। এর সদর দপ্তরের বারান্দায় সারি সারি ভারতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের ছবি শোভা পাচ্ছে । প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সি ভি রমন , সত্যেন বোস , শান্তি স্বরূপ ভাটনগর - ভারতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা এর সভাপতির পদ অলংকৃত করে গেছেন। ভারতের বুকে বিজ্ঞান চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে তাঁরা এই সংস্থাকে লালন করে গেছেন। ১৯১৪ সালে ব্রিটিশ রসায়নবিদ জে এল সিমোনসেন ও পি এস ম্যাকমোহন 'ব্রিটিশ এসোসিয়েশন ফর দি এডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স' এর আদলে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। খুব অল্প সময়েই ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস দেশের বিজ্ঞান চর্চার এক শীর্ষকেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রতি বছর স্বদেশ বিদেশের শীর্ষ বিজ্ঞানীরা, নোবেলজয়ীরা এতে অংশ নিয়েছেন।

এছাড়াও ISCA ভারতে বিজ্ঞানের প্রচার ও গবেষণা বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর তার বার্ষিক অধিবেশনে মহিলা ও শিশুদের জন্য বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করে। এখানে তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সাথে ভাবনার আদানপ্রদান করার সুযোগ পায়। সংস্থার কলকাতার সদর দপ্তরে এখনও ধুলোবালি মাখা পুরনো কাগজপত্র খুঁজলে পাওয়া যাবে বহু যুগ আগে কংগ্রেসে আলোচিত বিষয়ের কাগজপত্র, আবহাওয়া বিষয়ক আলোচনা, কলেরা গবেষণা, কৃষি বিজ্ঞান, আপেক্ষিকতাবাদ, নৃতত্ত্ব, আরো কত কি। আর এখন ভারতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরাই বিজ্ঞানচর্চার ক্রমাবনতি নিয়ে ISCA র বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলছে।

অন্যদিকে ISCA আর সরকারের আইনি লড়াইয়ের মধ্যে পড়ে তার ২০ জন কর্মচারী ও ১১ জন পেনশন ভোগীদের অবস্থা সঙ্গীন। তাদের বেতনের ভবিষ্যৎ নিয়ে কঠিন এক অনিশ্চিয়তার মধ্য দিয়ে চলছেন তাঁরা । অনুমান করা হচ্ছে রিট পিটিশন নিয়ে কোর্ট আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তার রায় দেবে। এই রায় যেদিকেই যাক না কেন সংস্থার কার্যকলাপে তা এক বিরাট পরিবর্তন আনতে চলেছে। IISER কলকাতার প্রাক্তন অধিকর্তা সৌমিত্র ব্যানার্জীর মতে, দুপক্ষেরই গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান হতে পারে ISCA র দিক থেকে তার কর্মপদ্ধতির গভীরভাবে পুনর্মূল্যায়ন করা । তাঁর মতে তকিছু একটা কারণ দেখিয়ে ISCA র দরজা বন্ধ করে দেওয়া একেবারেই কোন সমাধান নয় । অপর দিকে সভাপতি পাল এখন পরবর্তী কোর্টের শুনানির জন্য কাগজপত্র গোছাতে ব্যস্ত। তাঁর কথায় তআমাদের লড়াই বিজ্ঞানের স্বাধিকার বজায় রাখার লড়াই , অন্য সমস্ত চিন্তার চেয়ে এটাই এখন বড় ।

The Print– 1st August 2024 *এ প্রকাশিত (ঈষৎ সংক্ষেপিত)। এটি অনুবাদ করেছেন* IIT, *খড়গপুরের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. সিদ্ধার্থ সেন।*

চলে গেলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
(১.৩.১৯৪৪ – ৮.৮.২০২৪)

মনিরুল হক

একরাশ আশা আর স্বপ্ন নিয়ে শুরু হয়েছিল যে অজানা বিক্ষুব্ধ যৌবনপথ তা শেষ হল অমোঘ বার্ধক্যে, আশাহত মনে, শান্ত এক শহরে। আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, সি পি আই (এম) দলের বিশিষ্ট নেতা শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য গত ৮ আগস্ট কলকাতার পাম অ্যাভিনিউয়ে তাঁর ছোট্ট সরকারী আবাসনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বেশ কিছুদিন ধরেই বুদ্ধবাবু ফুসফুসের সংক্রমণ জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। অন্যান্য শারীরিক সমস্যাও তাঁর ছিল। প্রথমদিকে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হত চিকিৎসার জন্য, কিন্তু পরের দিকে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী বাড়িতেই চলছিল তাঁর চিকিৎসা।

বুদ্ধবাবুর মৃত্যু সি পি আই (এম) দলের কছে অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁদের দলের অগনিত নেতা-কর্মীরা শোকস্তব্দ। শোকার্ত অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতা-কর্মীরাও। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী,

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস, প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী সহ বহু বিশিষ্ট জনেরা। আমরাও তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে দেশে খাদ্য আন্দোলন এবং বিদেশে আগ্রাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামবাসীর আন্দোলন এরাজ্যের যুব সমাজকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। দলে দলে ছাত্র-যুবরা এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও ছিলেন সেইসব তরুনদের একজন। ব্যক্তিগতভাবে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁর বাবার তুতো ভাই। তবে তাঁর অন্য এক দিদি-জামাইবাবু মালবিকা ভট্টাচার্য-জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম অনুপ্রেরণা।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ১৯৬৬ সালে সি পি আই এম দলের সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৮ সালে তিনি দলের যুব শাখা ডি ওয়াই এফ আই-এর সম্পাদক মনোনীত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা রূপে সমাদৃত হন। তিনি ২০০২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটি পলিটব্যুরোর সদস্য ছিলেন। এর পর থেকে তিনি ক্রমশ দলীয় দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় সরে যেতে থাকেন।

১৯৭৭ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রথমবার বিধানসভর সদস্য নির্বচিত হন এবং ওই বছরই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের মন্ত্রীত্বভার গ্রহণ করেন। পরবর্তী বিধানসভা ভোটে তিনি পরাস্ত হন। কিন্তু তারপর ১৯৮৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত একটানা বিধানসভার সদস্য ছিলেন এবং তথ্য-সংস্কৃতি, স্বরাষ্ট্র প্রভৃতি দপ্তরের মন্ত্রী রূপে কাজকর্ম করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি উপমুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তার পর ২০০০ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল পরাজিত হয় এবং তিনিও যাদবপুর কেন্দ্র থেকে পরাজিত হন। এভাবেই শেষ হয় তাঁর সংসদীয় জীবন।

গ্যাট চুক্তির ফলে লগ্নি পুঁজি সারা পৃথিবীর মত ভারতেও অবাধে প্রবেশের সুযোগ পায়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মনে করত এই অবাধ পুঁজি প্রবেশের ফলে দেশে সমৃদ্ধি বাড়বে। কিন্তু বাম দলগুলি তা মনে করে না। সিপিআই (এম) দল এই নীতিকে New liberal Economy বলে আখ্যা দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের বিস্তারের লক্ষ্যে পুঁজির বিনিয়োগের জন্য বুদ্ধদেব বাবু উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। দলের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধদেব বাবুর সরকার রাজ্যে দেশী/বিদেশি পুঁজি প্রবেশের জন্য দলের মধ্যে তদ্বির শুরু করে এবং রাজ্যের জন্য বিদেশি পুঁজির প্রবেশের সিদ্ধান্ত তনুমোদন করিয়ে নেয়। ২০০৬ সালে দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য Special Economic Zone এর জন্য ব্যপক ছাড় দেওয়ার তৎপরতা শুরু করেন।

সালিম গ্রুপ, ডাউ কেমিক্যাল গ্রুপ, টাটা প্রভৃতির জন্য যথেচ্ছভাবে জমি অধিগ্রহণ শুরু হয়। কৃষক-সাধারণ মানুষ দিশাহারা হয়ে পড়েন, সহযোগী বাম দলগুলির তখন হতভম্ব অবস্থা।প্রশাসন ও দলীয় ক্যাডারদের সাহায্যে জোর করে জমি অধিগ্রহণের চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এ সময়ে বুদ্ধবাবুর অবস্থান হয়ে ওঠে একান্তভাবেই কৃষক-শ্রমিক বিরোধী। কখনও তিনি বলছেন, 'কেউ টাটাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না'; কখনও ধর্মঘটের বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি শিল্পপতিদের সভা বেছে নিচ্ছেন, বলছেন,-' আমি এমন একটা দল করি যে দল ধর্মঘট করে'; সংগ্রামরত নন্দীগ্রামের মানুষকে বুলেটের আগায় দাঁড় করিয়ে রেখে ব্রিগেড ময়দান কাঁপিয়ে বলছেন-'Blow Them Out'। মেনে নেয়নি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, তাঁরা ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট কে পরাস্ত করেন। বুদ্ধদেব বাবু যাদবপুর কেন্দ্রে পরাস্ত হন।

২০১১সালের নির্বাচন কার্যত বুদ্ধবাবুর রাজনৈতিক জীবনের ইতি টেনে দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই (এম) দলও সেই থেকে ব্যাকফুটে, এখনও ঘুরে দাঁড়াবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

রাজনীতির বাইরে বুদ্ধবাবুর আরও একটি পরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন সংস্কৃতিপ্রেমী ও সাহিত্যিক। সাহিত্যচর্চা ছিল তাঁর একান্ত ভালোলাগার একটি বিষয়। তিনি গ্যাব্রিয়েল গর্সিয়া মার্কজের দুটি লেখা অনুবাদ করেছেন। সেগুলি হল 'বিপন্ন জাহাজের এক নাবিকের গল্প' এবং 'চিলিতে গোপনে'। ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কির কবিতা 'এই আমি' ও তিনি অনুবাদ করেছেন। নাটক লিখেছেন- 'দুসময়'। তাঁর অন্যান্য রচনাগুলি হল 'ফিরে দেখা', 'নাৎসী জার্মানির জন্ম ও মৃত্যু', 'স্বর্গের নীচের মহাপৃথিবী' প্রভৃতি।তাঁর লেখা নাটক ' দুঃসময়।'

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘ সময়। তাঁরই সময় গড়ে উঠেছে নন্দন (ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম সেন্টার), প.ব. বাংলা আকাদেমি, নাট্য আকাদেমি, সঙ্গীত আকাদেমি , লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র , উর্দু আকাদেমি প্রভৃতি সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং প্রতিটি কেন্দ্রই খুব ভালো কাজ করেছে। বিখ্যাত কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

তাঁরই উদ্যোগে শুরু হয়। এই বিভাগের কাজে তিনি বিভাগীয় আধিকারিকদের প্রচুর স্বাধীনতা দিতেন।

একটা সময় ছিল যখন কি বাম, কি ডান; সব রাজনৈতিক দলেই মানুষ আসতেন মানুষের ভালো করার জন্য, দেশসেবার জন্য। এটাই ছিল মূল নীতি। এখন হয়তো তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বুদ্ধদেব সেই সাবেক নীতি অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তাই বলে রাজনীতিতে আসার এবং রাজনীতিক হিসাবে জীবন যাপন করার মূল নীতির কোন পরিবর্তন হয় নি। তাই বারবার অর্থনৈতিক সততা আর সাধারণভাবে জীবন যাপনের কথা বলে যাঁরা বুদ্ধবাবুকে বড় করে দেখাতে চাইছেন তাঁরা আদতে তাঁকে খাটো করছেন, ছোট করছেন। মনে রাখতে হবে রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশ ও মানুষের ভালো চাওয়া, সেই অনুযায়ী নীতি প্রণয়ন করা ও সেই নীতি কার্যকর করার পথ ও পন্থাই আসল কথা। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মূল্যায়ন সেই নিরিখেই হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

বাংলায় মৌলবাদী মুসলিমপন্থী সংগঠন

মজিবুর রহমান

কোনো মতাদর্শ বিশেষ করে ধর্মমতের মূল, গোড়া, শিকড় বা ভিত্তিকে আঁকড়ে থাকার তীব্র বাসনা, প্রয়াস বা পরিকল্পনাকে সাধারণভাবে মৌলবাদ বলা হয়। যারা মৌলবাদকে কার্যকর করার চেষ্টা করে তারা মৌলবাদী। মৌলবাদীরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থের আক্ষরিক ব্যাখ্যা ভিত্তিক আচরণবিধি মেনে চলার জন্য জোরাজুরি করে। এরা ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী নয়। বরং বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পক্ষে। মৌলবাদীরা সাধারণত অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়। ধর্মের নামে কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে হত্যা বা গণহত্যা করতে দ্বিধা করে না। এরা প্রায়োগিক উপযোগিতা বিচার না করে সকল ধর্মীয় অনুশাসনের অন্ধ অনুকরণ করে। তবে সময়ের সাথে সাথে মৌলবাদের পরিধিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। মৌলবাদ ধর্মের গণ্ডি ছাড়িয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে। মৌলবাদীদের আর শুধু পরকালে পোষাচ্ছে না, এখন ইহকালের রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এরা ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পৃথকীকরণের বিরোধী। বরং ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য এই দুইয়ের মিশ্রণ ঘটাতে বদ্ধপরিকর। মৌলবাদ এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির রূপ পরিগ্রহ করে। বর্তমানে এটার উপদ্রবই বেশি।

একজন নিরীহ ধার্মিক ব্যক্তিগত স্তরে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ধর্মাচরণ করে মানসিক শান্তি পেতে চায়।ধর্মীয় বাণীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা বোঝার মতো বিদ্যা বুদ্ধি তার থাকে না। নিজের মতো করে ঈশ্বর-আল্লাহ-ভগবানকে ডাকে। এককভাবে সে তার ধর্মপালন করে। কখনও কখনও প্রতিবেশীদের সঙ্গে যৌথ আয়োজনে সামিল হয়।কিন্তু মৌলবাদী বা সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিরা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে। এখানে ঈশ্বরের আরাধনা করার থেকেও বড় লক্ষ্য হল কোনো মতলব হাসিল করা। আর্থিক লাভ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক পরিচিতি অর্জন এমন এক বা একাধিক লক্ষ্য এই মতলবের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। মৌলবাদীরা ধার্মিকদের মতো এককভাবে ধর্মপালন করে ক্ষান্ত হয় না। তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে ধর্মের নামে মানুষকে সংগঠিত করার প্রয়োজন পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা তাদের কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, তারা ধর্ম ভাঙিয়ে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়। সেজন্য তারা সবসময় সংগঠন গড়ে তোলার ওপর জোর দেয়। সে সংগঠনের চরিত্র সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা সরাসরি রাজনৈতিক হতে পারে।

মৌলবাদের অনুশীলন করা মোটা মাথার মানুষের কাজ নয়। শিক্ষিত কিন্তু শয়তান প্রকৃতির 'আদম সন্তান'রা মৌলবাদের প্রচারে ও প্রসারে প্রধান ভূমিকা পালন করে। তারা সচেতন ভাবে ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।ধর্মের মোড়কে সুকৌশলে মৌলবাদকে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়। ধর্ম নামক 'আফিমের নেশায়' বুদ হয়ে থাকা মানুষ মৌলবাদীদের অযৌক্তিক, অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিবাদ করার সৎ সাহস হারিয়ে ফেলে। নিজেদের মানবেতর জীবনযাত্রাকে 'ভাগ্য' বলে মেনে নেয়। জীবন যন্ত্রণা দূর করার কোনো 'মন্ত্র' তারা জানতে পারে না।কিন্তু মৌলবাদী নেতারা বাস্তবে ধর্মব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন। তাঁরা ধর্ম কেন্দ্রিক ব্যবসা করে আর্থিকভাবে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হন।দেশে-বিদেশে তাঁদের প্রতিষ্ঠান চলে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারবারিরা রাষ্ট্র পরিচালনার উচ্চপদে আসীন হয়ে আখের গোছান।

মৌলবাদী বা সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিদের অনেকেই ধর্মপালনের প্রশ্নে তেমন সিরিয়াস নয়। যেমন, হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা তথা এক

সময়ের অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি বিনায়ক দামোদর সাভারকর (১৮৮৩-১৯৬৬) ধর্মাচরণের দিক থেকে প্রায় নাস্তিক ছিলেন। হিন্দুত্ববাদী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে (১৯২৪-২০১৮) কোনদিনই খুব একটা পূজার্চনা করতে দেখা যায়নি।প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি বাবরি মসজিদ ভেঙে রামমন্দির নির্মাণের আন্দোলনকে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে এনেছেন। কিন্তু তাঁর রামভক্তি রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, গৃহকোণে প্রবেশ করেনি। একই ভাবে মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ নেতা তথা পাকিস্তানের স্রষ্টা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকেও (১৮৭৬-১৯৪৮) ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে দেখা যায়নি। আবার, ধার্মিক বা ধর্মপ্রাণ হয়েও মৌলবাদী বা সাম্প্রদায়িক না হওয়ার অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) মনেপ্রাণে হিন্দু ছিলেন আর আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। কিন্তু তাঁরা দুজনই ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সাধনার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।

ইংরেজি 'ফাণ্ডামেন্টালিজম'-এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয় 'মৌলবাদ'। একই ভাবে 'ফাণ্ডামেন্টালিস্ট'-এর বঙ্গানুবাদ হল 'মৌলবাদী'। তবে ইংরেজি শব্দ দুটি অনেক পুরনো হলেও বাংলা পরিভাষা দুটি একেবারে নতুন। এজন্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচনায় 'মৌলবাদ' বা 'মৌলবাদী' শব্দদ্বয় সেভাবে ব্যবহৃত হয়নি।ধর্মীয় মৌলবাদ-মৌলবাদী বোঝাতে তাঁরা ব্যবহার করেছেন ধর্মান্ধ, ধর্মীয় গোঁড়ামি, ধর্মীয় কুসংস্কার, ধর্ম সম্প্রদায়, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মোন্মাদ পিশাচ, মোল্লা, ঈশ্বরদ্রোহী পাশবিকতা, ধর্মের বেশে মোহ, ধর্মবিকার প্রভৃতি শব্দবন্ধ। মোটামুটিভাবে ভাবে বলা যায়, বাংলা ভাষায় পত্রপত্রিকায় 'মৌলবাদ' বা 'মৌলবাদী' শব্দের আবির্ভাব ঘটেছে গত শতকের আশির দশকে যখন থেকে রাজনীতিতে বিজেপির উত্থান ঘটেছে এবং বাবরি মসজিদ-রাম মন্দির বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে।

মৌলবাদ একটি বিশ্বজনীন, বহুকালীন ও সর্বধর্মীয় ব্যাপার। বিভিন্ন ধর্মের মূল নীতি হিসেবে শান্তি, অহিংসা অথবা সার্বজনীন আত্মীয়তার কথা বলা হলেও বাস্তবে হিংসায় কোনো ধর্মের মানুষেরই আপত্তি অথবা অনাগ্রহ থাকতে দেখা যায় না। হয়তো ধর্মশাস্ত্রের মধ্যেও হিংসা-বিদ্বেষের বীজ রয়েছে। আধুনিক মৌলবাদের উদ্ভব হয়েছে আমেরিকায় উনবিংশ শতাব্দীতে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের হাত ধরে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে ইসরাইলে ইহুদী, মায়ানমার ও শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্য ও আফগানিস্তানে মুসলিম, ভারতে হিন্দু অথবা পাঞ্জাবে শিখ মৌলবাদকে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেছে। মৌলবাদীরা যখন বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করে বেড়ায় তখন তারা জঙ্গি বা মিলিট্যান্ট হিসেবে পরিচিত হয়। যখন বেসামরিক ব্যক্তিদের প্রাণহানির পাশাপাশি রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সঙ্গেও লড়াই করার শক্তি ধরে তখন তাদের নাম হয় সন্ত্রাসবাদী বা টেররিস্ট। সরকার জঙ্গিদের ধরপাকড় বা সন্ত্রাসবাদীদের দমন করার চেষ্টা করে।আল-কায়দা বা তালিবানদের মোকাবেলায় সন্ত্রাসবাদকে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনই কিন্তু মৌলবাদী অথবা সাম্প্রদায়িক হিসেবে গণ্য বা চিহ্নিত হতে চায় না। তারা ধর্মের নামে বিভেদ ও বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগও অস্বীকার করে।মানুষের ধর্মভিত্তিক পরিচিতির ওপর বাড়াবাড়ি রকমের জোর দেওয়াকে তারা অন্যায় বা অপরাধ বলে মনে করে না। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সাধারণ মানুষ বুঝে হোক না বুঝে হোক মৌলবাদী বা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সমর্থন করে। কখনও কখনও তারাই দেশের প্রধান দল বা সংগঠনে পরিণত হয়। এখন ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছে।

অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলিমপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন হল নিখিল ভারত মুসলিম লীগ যা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায়।ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লাহ এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। মুসলিম লীগ লর্ড কার্জনের ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ঘোষিত বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করার পরিবর্তে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটিকেই তারা অগ্রাধিকার দিত। মুসলিম লীগের প্রস্তাব অনুসারেই মুসলমান অধ্যুষিত কিছু এলাকা নিয়ে ভারত ভেঙে পাকিস্তান গঠিত হয়।ভারত বিভাজনের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের এক নম্বর দল হলেও পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের অন্যান্য রাজ্যে একটি দুর্বল রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। এখন কেরালা

রাজ্যের বাইরে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব তেমনভাবে অনুভূত হয় না। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাদের সাতজন প্রার্থী জয়লাভ করেন এবং মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে আবু তালেব চৌধুরী সাংসদ নির্বাচিত হন। এছাড়া তাদের বলার মতো আর কোনো সাফল্য ছিল না বা নেই।

মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলমিন বা মিম ১৯২৭ সালে হায়দ্রাবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মুসলমানদের মধ্যে একতা ও সংহতি স্থাপন করার জন্য গড়ে উঠেছিল। এই রাজনৈতিক দলটির বর্তমানে সর্বভারতীয় সভাপতি হলেন ব্যারিস্টার আসাদ উদ্দিন ওয়াইসি। তেলেঙ্গানা ছাড়াও মহারাষ্ট্র ও বিহারে মিমের বিধায়ক রয়েছে।২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কিছু আসনে প্রার্থী দিলেও সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেনি। ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও এরাজ্যে মিমের কোনো কার্যকলাপ চোখে পড়েনি।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী (১৯০৩-৭৯) ১৯৪১ সালে লাহোরে প্রতিষ্ঠা করেন জামায়াত-ই-ইসলামী। ভারত ভাগের পর ১৯৪৮ সালে এলাহাবাদে এটি জামায়াত-ই-ইসলামী হিন্দ নামে পুনর্গঠিত হয়। এখন এটির সদর দপ্তর নতুন দিল্লিতে। এই সর্বভারতীয় সংগঠনটির পশ্চিমবঙ্গেও অ্যাকটিভিটি রয়েছে। জাতীয় জরুরি অবস্থার সময় সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ করা হয়।পরে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৯২ সালে দ্বিতীয় বার এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য এই নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে দেয়। ২০১১ সালে এদের রাজনৈতিক ফ্রন্ট ওয়েলফেয়ার পার্টি অব ইন্ডিয়া স্থাপিত হয়। এর জাতীয় সভাপতি হলেন সৈয়দ কাশেম রসুল ইলিয়াস। দলটি পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন নির্বাচনে অল্পবিস্তর অংশগ্রহণ করে। তবে এখনও পর্যন্ত বলার মতো কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়া বা সিমি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালে উত্তর প্রদেশের আলিগড়ে।এক সময় পশ্চিমবঙ্গে এই সংগঠন যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। এই ইসলামপন্থী ছাত্র সংগঠনটির বিরুদ্ধে একাধিকবার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে এবং ভারত সরকার এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তবে কোনো কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মনে করেন, ইসলামপন্থী সিমিকে নিষিদ্ধ করা হলে হিন্দুত্ববাদী দুর্গা বাহিনী, শিবসেনা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘকেও নিষিদ্ধ করা উচিৎ।

২০০৬ সালে কর্ণাটক ফোরাম ফর ডিগনিটি ও ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফ্রন্টের একীভূতকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া (পি এফ আই)। ইসলামী রাজনীতি ও সমাজ সেবামূলক এই সংগঠনটির সদর দপ্তর নতুন দিল্লিতে অবস্থিত। সংগঠনটি মুসলিম সংরক্ষণের পক্ষে কথা বলে এবং ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকার দাবি করে। পশ্চিমবঙ্গে পি এফ আই-এর মজবুত সংগঠন ছিল। ২০২২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের অধীনে এটিকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অনেকেই মনে করে, আর এস এস ও পি এফ আই একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

একটি নিবন্ধিত ও অস্বীকৃত রাজনৈতিক দল হল সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অব ইন্ডিয়া (এস ডি পি আই)। ২০০৯ সালে স্থাপিত এই দলটির সদর দপ্তর নতুন দিল্লিতে অবস্থিত। মূলত মুসলিমপন্থী এই দলটি দলিত তথা নিম্নবর্গের হিন্দুদের পক্ষেও কথা বলে। কেরালা, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে এস ডি পি আই-এর ভালো উপস্থিতি রয়েছে। বিধানসভা কিংবা লোকসভায় এদের কোনো সদস্য না থাকলেও পঞ্চায়েত স্তরে প্রতিনিধি রয়েছে।

হুগলি ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী ২০২১ সালের ২১শে জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা করেন রাজনৈতিক দল ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (আই এস এফ)।ওই বছর বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের অন্যতম জোটসঙ্গী হিসেবে ৩২টি আসনে খাম চিহ্নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।এই নির্বাচনে বাম-কংগ্রেসের কোনো প্রার্থী জিততে না পারলেও আই এস এফের নওশাদ সিদ্দিকী ভাঙড় কেন্দ্রে জয়লাভ করেন। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এরা এককভাবে ভোটে লড়েছে।আদিবাসী ও দলিতদের পক্ষে কথা বললেও এই দলের সমর্থক প্রধানত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। নামের সঙ্গে 'সেক্যুলার' শব্দটি থাকলেও ধর্মীয় নেতাদের দলকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে মেনে নেওয়া যায় না।

মৌলবাদ বা সাম্প্রদায়িকতা কোনো সদর্থক ভাবনা নয়।যুক্তিবাদ ও উদারতা বা সামগ্রিকভাবে প্রগতিশীলতা ছাড়া কোনো কমিউনিটির উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলার মুসলিম বা ইসলামিক সংগঠনগুলো মুসলিম সমাজের উন্নয়নে বিশেষ

অবদান রাখতে পেরেছে বলে মনে হয় না। রাষ্ট্রীয় জীবনের মূল প্রবাহের সকল প্রতিবন্ধকতা অসাম্প্রদায়িক অবস্থান বজায় রেখেই জয় করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা কোনো সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান করে না। বরং সমস্যা আরও বৃদ্ধি করে।

লেখক মুর্শিদাবাদ জেলার কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে গেলে অসংগঠিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে

সৌর বসু

বিজেপি দিল্লিতে ক্ষমতার গদিতে আসীন হয় ২০১৪ সালে।। নরেন্দ্র দামোদর মোদি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। বিজেপির স্লোগান ছিল 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ।' এই স্লোগান এর মধ্যে দিয়ে সার্বিক উন্নয়নের চিত্রটাই স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিজেপি এই স্লোগানকে অনুসরণ করেনি। বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে ১০ বছর ক্ষমতায় ছিল ইউ পি এ সরকার। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মনমোহন সিং এর নেতৃত্বে এই সরকার ১০ বছর ভারতে শাসন করে গেছে। এই দশ বছরে ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে জিডিপি। এছাড়াও মনমোহন সিংয়ের আমলে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মসংস্থান কর্মসূচি অন্যতম। এছাড়া শিক্ষার অধিকার , খাদ্যের অধিকার , তথ্যের অধিকার প্রমূখ কর্মসূচি মনমোহন সিংয়ের আমলে গৃহীত হয়।

২০১৪ সালে যখন নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতায় আসে তখনও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার ভালো ছিল। যদিও সমাজকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত করার প্রচেষ্টা মোদি সরকার ক্ষমতা আসার পর থেকেই শুরু করে দিয়েছে। সবকা বিকাশ এর কোন ছায়া সরকার পরিচালনায় পড়ে নি।

২০১৬ সালে ঘোষিত হয় নোট বন্দি। সংসদে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে নরেন্দ্র মোদী এই ঘোষণা করেন।। পরিসংখ্যানে প্রকাশ পাচ্ছে

নরেন্দ্র মোদির ক্ষমতায় আসার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বছরের ২ কোটি বেকার কে কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত করবেন। পরিসংখ্যানে প্রকাশ পাচ্ছে ২০১৬ সালে ২. ৩১ লক্ষ বেকার চাকরি পেয়েছে এবং ২০১৭ সালে চাকরি পেয়েছে ৪.১৭ লক্ষ বেকার। ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে কর্মসংস্থানে হার ছিল ৪.১৭ শতাংশ এবং ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেই হার এসে দাঁড়ায় ৬.৬ শতাংশে।

বিমুদ্রাকরণ, জিএসটি এবং তারপরে কোভিড মহামারী ভারতের অর্থনীতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে। সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্র। কোভিড মহামারীর সময় যারা চাকরি ছেড়ে গ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল , তাদের কর্ম ক্ষেত্রে পুনর্বাসন অনেক ক্ষেত্রেই করা হয়নি।। উপায়ান্তর না দেখে এই রাস্তার উপরে পসরা বিছিয়ে তারা বসে গেছে। ভারতবর্ষের অর্থনীতির ৯০ অসংগঠিত ক্ষেত্র ।। অসংগঠিত ক্ষেত্রে হাজার ধরনের জীবিকা আছে। রিকশা চালানো থেকে শুরু করে , পান সিগারেটের দোকান এমনকি দালালি পর্যন্ত। নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিমুদ্রাকরণ জিএসটি, কোভিড মহামারীর ফলে প্রতিবছর অসংগঠিত ক্ষেত্রে ১০ থেকে ১২ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। অর্থাৎ অসংগঠিত ক্ষেত্রে ৮ বছরে ৮০ থেকে ৮৫ লক্ষ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে।

কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে উজ্জ্বলা ও একটি যোজনা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ কোটি টাকা নিম্নবিত্ত মানুষকে দেওয়া হয়েছে।

কোভিড মহামারীর পর অর্থমন্ত্রী সীতারামন তিন তিনটি বাজেট পেশ করেছেন। কিন্তু কোন বাজেটেই এই অর্ধভুক্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের মানুষদের জন্য কোন দিশা তারা দেখাতে পারেনি। পূর্বের বাজেটগুলির মত এ বছরও তারা যোগান ভিত্তিক মুক্ত অর্থনীতির উপরে আস্থা রেখেছেন।। কিন্তু উন্মুক্ত বাণিজ্যের উপর ভরসা রাখার ফলে যেটা হচ্ছে জিডিপি বৃদ্ধি হচ্ছে বেশ দ্রুত হারে কিন্তু তার সুফলটা পৌঁছচ্ছে না নিচুতলার মানুষের কাছে। যার ফলে দেখা দিচ্ছে বিরাট অর্থনৈতিক বৈষম্য। এমনকি এই বৈষম্য স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগের অবস্থার থেকেও ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের বছর। নির্বাচনের আগে হঠাৎ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ঘোষণ করলো আমাদের দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংকের এই পরিসংখ্যান পেশ করার কথা নয়। রিজার্ভ ব্যাংকের রিপোর্ট

বলছে বিগত ১০ বছরে ১৮ কোটি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। এই রিপোর্ট দেখে অনেক অর্থনীতিবিদ তাজ্জব বনে গেছেন। অনেকে বলছেন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রিজার্ভ ব্যাংক এই রিপোর্ট তৈরি করেছে। বাস্তব ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান যে বৃদ্ধি পায়নি তা নয়। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বৃদ্ধি কোথায় পেয়েছে? বৃদ্ধি পেয়েছে অসংগঠিত ক্ষেত্রে। কোভিদ মহামারীর সময় কর্মচ্যুত হয়ে যে সমস্ত মানুষ গ্রামে ফিরে এসেছিল , তারা গ্রামের আশেপাশে ছোটখাটো দোকান খুলে বসেছে এ কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ পানের দোকান কেউ হয়তো বা মাটিতে বসে সবজি বিক্রি করছে। অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর মতে যারা চাকরি করছেন তারা মাইনে পাচ্ছেন, যারা বাণিজ্য করছেন মুনাফা লাভ করছেন। অর্থাৎ কিছু রোজগার করছেন। কিন্তু বাধ্য হয়ে যারা রাস্তায় বসছেন তাদের মাসের আয় হয়তো হচ্ছে ১০ হাজার টাকা বা তারও কম। আমাদের দেশের দারিদ্ররেখা অনুযায়ী গ্রামীন এলাকায় মাসে হাজার টাকা বা তার বেশি এবং শহরে এলাকায় মাসে বারোশো টাকা মোটামুটি ভাবে যারা রোজগার করছে , তারা দারিদ্র রেখার উপরে আছে। রিজার্ব ব্যাংকে যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে, তা এদের সকলকে নিয়েই। কাজেই পরিসংখ্যান অনুযায়ী কর্মসংস্থান বেড়েছে ঠিকই কিন্তু গরিব মানুষের পকেটে টাকা ঢোকেনি।

এবারের বাজেটে যে বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলো আপাতভাবে খুব ভালো বলে মনে হয়। যেমন নারীর উন্নয়ন, যুবকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, কৃষি উন্নয়ন এবং এবং দারিদ্র দূরীকরণ পরিকল্পনা। কিন্তু এর ভেতরে গিয়ে ঢুকলে গলদগুলো চোখে পড়বে। আমাদের দেশের ষাট শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেশের জিডিপি তে কৃষি ক্ষেত্রের অবদান ১৮ শতাংশের বেশি। কিন্তু আমাদের মোট ৪৮ লক্ষ কোটি টাকা বাজেটের মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১. ৫৪ লক্ষ্য কোটি টাকা। মোট বাজেটে মাত্র ৩ শতাংশ। সুতরাং বাজেটে যে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হয়েছিল , কার্যক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটে নি। তাছাড়াও খাদ্য উৎপাদনের যে পরিসংখ্যান, সেখানেও কিন্তু গলদ আছে। কারণ গত বছর বলা হয়েছিল খাদ্যশস্য রেকর্ড পরিমাণ উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু তারপরে দেখা গিয়েছিল খাদ্যশস্যের রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের তথ্যভিত্তিক রিপোর্টগুলো নিয়ে এতদিন কোন প্রশ্ন জাগেনি। পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিষয়ে মহালনাবিশের আমল থেকেই আমাদের দেশে ভালো কাজ হয়েছে ।কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তথ্যভিত্তিক রিপোর্টার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে বসেছে।

কারণ বর্তমান সরকার ন্যাশনাল সার্ভের রিপোর্ট চেপে দেয়। জনগণনা রিপোর্ট প্রকাশ করে না। যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে যে তিন ধরনের প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে অর্থনীতিবিদরা মোটেই আশাপ্রদ নন। অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার মনে করেন এগুলো যুবকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে না। কারণ অসংগঠিত ক্ষেত্রে চাকরি নেই। সংগঠিত ক্ষেত্র পুঁজি নিবিড় বা capital intensive. সেখানে উৎপাদনের জন্য যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এখন রোবোট ও চলে এসেছে। সংগঠিত ক্ষেত্রে চাকরির আকাল। তাছাড়া বাজারে চাহিদার অভাব। চাহিদার অভাবের কারণে বিনিয়োগ নেই। কাজেই ইন্টার্নসিপ বলুন বা apprentice , এর কোন ভবিষ্যৎ নেই। নেহাৎই চোখে ধুলো দেওয়া।

জরুরি অবস্থা বনাম মোদী জমানা এবং ফ্যাসিবাদ

নন্দন রায়

(প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর সরকার গত দশ বছরে সংবিধান লঙ্ঘন করে একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত সংসদে দেড় শতাধিক সাংসদকে সাসপেন্ড করে ন্যায় সংহিতা নামক জনবিরোধী ফৌজদারি বিধির প্রবর্তন করেছেন। এবার মোদীর উদ্দেশ্য ছিল বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরে এসে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান বদলে দেওয়া। সেটা হয়নি। মোদী প্রায়শই ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর আমলের জরুরি অবস্থার কথা বলে সংবিধান লঙ্ঘনের উদাহরণ দেন। ইন্দিরা গান্ধী সংবিধানের ৩৫২ ধারা অনুযায়ী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ২১ মাস পর তিনি জরুরি অবস্থা রদ করে নির্বাচন করান, কিন্তু পরাজিত হয়ে ক্ষমতা ত্যাগ করেন। মোদী গত দশ বছর ধরে দেশে কার্যত অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি করে রেখেছেন। সমস্ত স্বশাসিত সংস্থার স্বাধীনতা হরণ করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক নন্দন রায়ের ২০০৮ সালে লিখিত প্রবন্ধটি প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় প্রকাশ করলাম। এটি তৃতীয় ও শেষ কিস্তি।)

(৩)

ফ্যাসিবাদ ও মোদী জমানা

মোদী জমানার কর্মসূচি সম্পর্কে ওপরে এতক্ষণ যা আলোচনা হল তার প্রতিটিই ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলে যায়-উচ্ছৃঙ্খল জনতার তাণ্ডব, ‘রাষ্ট্রশক্তি ও কর্পোরেট শক্তির মেলবন্ধন’, সংখ্যালঘু হতভাগ্য জনতাকে উৎপীড়নের

লক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার, যুক্তিহীনতার প্রশ্রয়, স্বাধীন যুক্তিবোধ ও চিন্তাশীলতাকে প্রোৎসাহিত করে এমন উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলির ধ্বংস সাধন ইত্যাদি যা যা ঘটে চলেছে, তার সবকিছুই ফ্যাসিবাদের লক্ষণ। এই নিয়ে বিস্তারিত লেখালেখি হয়েছে। ফলে আমরা এসবের আবার বিস্তৃত ব্যাখ্যায় যাব না। আমরা বরং কম আলোচিত বিষয়গুলির দিকে নজর রাখি।

যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা আমরা আলোচনা করছিলাম, সেগুলি সাধারণভাবে দক্ষিণপন্থী দলগুলির থেকে পৃথকভাবে ফ্যাসিবাদী আন্দোলনকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে, রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন ফ্যাসিবাদকে নয়। ফ্যাসিবাদী আন্দোলনকে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হতে গেলে অতিরিক্ত আরও কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হয়। কোনো পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদী আন্দোলন কেন্দ্রীয় রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়, ক্ষমতা দখলের জন্য কোন শ্রেণিভিত্তির ওপরে তারা নির্ভর করে, সাম্প্রতিক সময়ে ফ্যাসিবাদ যখন সত্যি সত্যিই ক্ষমতা দখল করতে পেরেছে তখন তার আরও অগ্রগতিকে আমরা কীরূপে দেখব এগুলিই হচ্ছে জ্বলন্ত প্রশ্ন। ফ্যাসিবাদী আন্দোলনকে একাধারে দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া দলগুলির থেকে এবং অন্যধারে সারা বিশ্বে বামপন্থীদের ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে নিকেশ করার জন্য যে খুনে বাহিনী ব্যবহার করা হয় (যেমন চিলিতে পিনোশে সরকারের আমলে, তারও আগে ইন্দোনেশিয়ায় জেনারেল সুহার্তোর আমলে, কলম্বিয়ায় অথবা হালে মায়ানমারে সামরিক জুন্টার জমানায়) তার থেকে তফাৎ করতে যদি আমরা সক্ষম হই তাহলে বোঝা যাবে যে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় উদ্ভূত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট সাধারণভাবে বামপন্থীদের শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে বিদ্যমান ব্যবস্থাটিকে প্রশ্নের মুখে ফেলে। এই অবস্থায় বাম শক্তিকে রোধ করতে ফ্যাসিবাদ সহ যে-কোনো দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে (সামরিক অভ্যুত্থান সহ) কাজে লাগানো হয়। এই ব্যাখ্যায় ফ্যাসিবাদের আলাদা কোনো বিশেষত্ব নেই। ফলে ফ্যাসিবাদের উত্থানের শর্ত হিসেবে এই ব্যাখ্যা আংশিক সঠিক হলেও যথেষ্ট নয়। ১৯৩০-এর দশকে এবং সাম্প্রতিক ভারতে এমন সংকট সৃষ্টি হয়েছিল যা একদিকে লিবারেল বুর্জোয়ারা যেমন মোকাবিলা করতে পারছিল না, তেমনি অন্যদিকে নিজেদের নানা দুর্বলতার কারণে বামপন্থীরাও মুক্তির কোন বিকল্প দিশা জনগণের সামনে উপস্থিত করতে পারছিল না। অতএব ফ্যাসিবাদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পেছনে লিবারেল বুর্জোয়াদের ব্যর্থতা যেমন আছে, তেমনি বামপন্থীদের ব্যর্থতাও রয়েছে- ফ্যাসিবাদ ব্যর্থ বিপ্লবের ফসল। সুতরাং সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শ্রমজীবীশ্রেণির আন্দোলনের ক্রমশ বেড়ে চলা জঙ্গিপণাকে প্রতিরোধ করতে শাসক অলিগার্কির নেহাত ষড়যন্ত্রের ফল হিশেবে ফ্যাসিবাদের উত্থানকে ব্যাখ্যা করাটা ঠিক হবে না।

কর্পোরেট ফিনান্সিয়াল অলিগার্কি ফ্যাসিস্টদের সাথে গাঁঠছড়া বাঁধে কেন, এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে ফ্যাসিবাদের বিশেষ চরিত্রটি আমাদের অনুধাবন করতে হবে। ফ্যাসিবাদ কেবল গুন্ডা ও খুনিদের গোপন সংগঠন নয়, এটি আদতে একটি আন্দোলন। ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা তোগলিয়াত্তি বলেছিলেন ফ্যাসিবাদের একটি শ্রেণিচরিত্র ও একটি গণচরিত্র উভয়ই আছে। প্রথমত, নির্দিষ্ট এক অর্থনৈতিক সংকটের পরিস্থিতিতে যখন জনগণ এই দমবন্ধ অবস্থা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়, অর্থাৎ যখন বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে, দ্বিতীয়ত, যখন সাবেক অ-ফ্যাসিস্ট দলগুলি এই সংকটকে স্বীকার করতে চায় না এবং তৃতীয়ত, বিভিন্ন কারণে বামপন্থীরা এতটাই হীনবল থাকে যে তারা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ যখন এক বন্ধাবস্থা (স্ট্যাটিকএ) বিরাজ করে, তখনই ফ্যাসিবাদ পল্লবিত হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় জনসমষ্টির এক বৃহৎ অংশ, বিশেষত অ-শ্রেণিবদ্ধ (amorphous – যার মধ্যে কৃষক জনতাও পড়ে) মধ্যবিত্তদের একটা বড়ো অংশ এবং উচ্ছন্নে যাওয়া লুম্পেন প্রলেতারিয়েতরা মরিয়া হয়ে একজন 'উদ্ধারকর্তার' (messiah) পেছনে ধাবিত হয় যিনি তাদের হতাশা ও দুর্দশার কানাগলি থেকে উদ্ধারের পথ দেখাবেন। এইরকম একজনকে সকলের সামনে খাড়া করে ফ্যাসিবাদ রাজনৈতিক মঞ্চের কেন্দ্রস্থলে হাজির হয়। রাজনৈতিক অচলাবস্থা থেকে জনতাকে উদ্ধার করার জন্য যে শপথবার্তা তারা প্রচার করে সেই শপথের কোনো বিশ্বাসযোগ্য ও যুক্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মসূচিই নেই। কীভাবে বছরে দু'কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, আত্মহত্যার মিছিলের মধ্যে কিভাবেই বা কৃষকের আয় দ্বিগুণ বেড়ে যাবে, প্রত্যেক নাগরিকের একাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা পাঠানো আদৌ সম্ভব কিনা।

অন্যদিকে বিশ্বায়িত পুঁজি মুনাফা ও মুক্ত বাণিজ্যের স্বার্থে কোনো দেশে রাজস্ব ঘাটতি পছন্দ করে না কারণ সরকারের যে কোনো বর্ধিত ব্যয়, এমনকি সামরিক ব্যয়ও রাজস্ব ঘাটতির মূল্যে মেটানো হবে যেটা পুঁজির না-পসন্দ।

আবার পুঁজিপতিদের ওপর বর্ধিত আয়কর অথবা (এখন যা নেই) সম্পদ কর প্রভৃতি চাপিয়ে যে বাড়তি অর্থ জোগাড় করে বেকারত্ব দূর করবে, সে পথেও নিষেধ আছে। সুতরাং নয়া উদারবাদী জমানায় ফ্যাসিবাদ আর আগের মতো বেকারী দূর করার সামর্থ্যের অধিকারী নয়। বছরে দু'কোটি চাকরি নেহাতই জুমলা হিসেবে থেকে যাবে।

সুতরাং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দুর্দশা এমনকি দুবেলা দুমুঠো খেতে পাওয়াটাও নিশ্চিত করতে পারে না, মোদী যতই দেশের এগিয়ে চলার কথা বলুক না কেন। ফলে নয়া ফ্যাসিবাদ একদিকে যেমন তার অস্তিত্বের বৈধতা অথবা ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারে না, অন্যদিকে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়েও এর অবলুপ্তির আশাও নেই। আমাদের দেশের মতো সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে এর উচ্ছেদ হবে এমন আশা করাটা খুব কঠিন কারণ এই ধরণের নির্বাচন এখন বিশ্বায়িত পুঁজির একচ্ছত্র আধিপত্যকে এক সম্মানজনক বৈধতা প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে পরিণতি হিসেবে যে সম্ভাবনাগুলি প্রকট হয়ে উঠেছে সেগুলি হল নির্বাচনী পদ্ধতিকে কবজা করে, উন্মত্ত দেশপ্রেমের জিগির তুলে এবং রামমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেও ২০২৪এর নির্বাচনে মোদীর পরাজয় ঘটতে পারে কিন্তু যে সরকারই আসুক না কেন, নয়া উদারবাদের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য খেটে খাওয়া মানুষদের দুর্দশা দূর করার পথে না এগোলে সেই সরকার অচিরেই জনপ্রিয়তা হারাবে এবং এই ঘটনা ঘটবে এমন সময়ে যখন মোদীর দীর্ঘ রাজত্ব গোটা সমাজের অনেকটা ফ্যাসিবাদীকরণ ঘটিয়ে ফেলেছে, মানুষে মানুষে বিভাজন, অসহিষ্ণুতা, এবং বৈরিতা বাড়িয়ে তুলেছে। এর ফল আর একটা নির্বাচন এবং আবার একটা ফ্যাসিস্ট সরকারের মসনদে বসা। উদাহরণ হিসেবে মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকারকে পরাজিত করে কংগ্রেসের কমলনাথ সরকারের কথা বলা যায়। হিন্দুত্বের প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিয়ে সুযোগ লোটার ক্ষেত্রে কংগ্রেস একই পথে চলেছে এবং অল্পদিনের মধ্যেই বিজেপি সরকার উলটে দিয়ে নির্বাচনে জিতে ফের ক্ষমতায় বসেছে। কাজেই ফ্যাসিবাদের প্রতি দোলাচলতা বা একটা ঝোঁক এদেশে চলছেই।

ফ্যাসিস্ট শক্তি ক্ষমতায় আসুক বা না আসুক, তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি সঞ্চয়ের চাপ যে সমাজকে ফ্যাসিস্ট মানসিকতাসম্পন্ন করে তুলেছে তার প্রমাণ আমরা অহরহ পাচ্ছি। এর জন্য ভারতকে ১৯৩০এর মতো ধ্রুপদি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র হতে হবে না। যা হতে চলেছে তা হল এক চিরস্থায়ী ফ্যাসিবাদের দৌরাত্ম্য। ফ্যাসিবাদের উত্থানের কারণগুলি দূর করতে না পারলে আমাদের এক ব্যর্থ খণ্ডিত চির দুর্ভিক্ষের ভারতবর্ষকে নিয়ে বসে থাকতে হবে।

(শেষ)

এবারের লোকসভা নির্বাচন ঃ পক্ষপাতদুষ্ট চরম অনৈকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে – অ্যাসোশিয়েশন অব ডেমোক্রেটিক রিফর্মসের রিপোর্ট

অমিতাভ সিংহ

এবারের নির্বাচনে ছিয়ানব্বই কোটি ভোটারের মধ্যে ৬৩ কোটি ভোট পড়েছে, যার মধ্যে পাঁচ কোটি ভোট নিয়ে প্রশ্ন উঠল।শতাংশের হিসাবে তা ৮%।অ্যাসোশিয়েশন অব ডেমোক্রেটিক রিফর্মস সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তাতে প্রশ্ন করা হয়েছে 'এবারের লোকসভা নির্বাচনে কি ভোটের রায়দান চুরি করা হয়েছে ?' তাদের এই রিপোর্টে বলা হয়েছে ভোটে ব্যাপক অসদাচরণ ও কর্তব্যে অবহেলা করেছে নির্বাচন কমিশন। তাদের কাছে এই রিপোর্ট পাঠিয়ে তাদের বক্তব্য জানতে চাইলেও নির্বাচন কমিশন এখনও পর্যন্ত তার কোনও জবাব দেয় নি, আদৌ দেওয়ার মত কিছু আছে কিনা তাও জানতে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি ?

আসল ব্যাপারটা হল প্রশ্ন উঠে গেছে ১৫ টি রাজ্যের ৭৯ টা কেন্দ্রে এনডিএ তথা বিজেপির জয় নিয়ে। প্রশ্ন উঠেছে যেখানে ভোটের গরমিল ধরা পড়েছে প্রায় পাঁচ কোটির।আরো নির্দিষ্টভাবে বললে চার কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ ছেচল্লিস হাজার আটশ পঁচাত্তর বা ৪,৬৫,৪৬,৮৭৫ টি ভোট। অর্থাৎ ৫৪৩ টি লোকসভা ধরলে কেন্দ্রপ্রতি পঁচাশি হাজারেরও বেশী। এবারের নির্বাচনে বেশীরভাগ কেন্দ্রে এই ব্যবধানের কমে একজন প্রার্থী জয়ী হয়েছে। এই গরমিলটা হচ্ছে নজিরবিহীন ভাবে প্রাথমিক ভোটের হার ও চূড়ান্ত ভোটের হারের সংখ্যার মধ্যে ফারাক, বলা বাহুল্য যা বড্ড বেশী। কোনও গণতান্ত্রিক নির্বাচনে যা একেবারেই কাম্য নয়। প্রতিটি দলের ও প্রার্থীর এজেন্টের কাছে ফর্ম ১৭ সি দেওয়ার কথা প্রিসাইডিং অফিসারের।তাতে সেই বুথে কত ভোটার,কতজন

ভোট দিলেন ইত্যাদি তথ্য লেখা থাকে।দিনের শেষে এগুলি একত্রিত করলে কয়েক মিনিট লাগবে চূড়ান্ত ভোটদানের হিসাব করতে।এবার কেন ১১ দিন পর তা প্রকাশ করতে হল তার ব্যাখ্যা তো তারা দিতে পারলেন না, এখন মনে হচ্ছে এই কর্মটি কমিশন, সরকার তথা বিজেপিকে জালিয়াতির সুবিধা দেওয়ার জন্যই করেছিলেন।

যে ৭৯ টি কেন্দ্র নিয়ে এই বিতর্ক বা সন্দেহ সেখানে এনডিএ প্রার্থীদের জয়ের ব্যবধান গরমিল ধরা পরা ভোটের চেয়ে অনেকটাই কম। এই ঘটনা প্রমাণ করে এই আসনগুলোতে আসলে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়ার প্রার্থীরা। সেক্ষেত্রে এখন কেন্দ্রের মসনদে বসার কথা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার।

এবারের লোকসভা নির্বাচন সাতটি পর্বে হয়েছে। এপ্রিলের ১৯ ও ২৬, মে মাসের ৭,১৩,২০ ও ২৫ তারিখ এবং ১ জুন। দেড় মাস জুড়ে সাত দফায় নির্বাচন করার আরেকটি কারণ এতদিন ধরে যাতে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মোদী যাতে সব জায়গায় প্রচার করার সুযোগ পান। প্রথম দফার ভোট গ্রহণের পর ১১ দিন বাদে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোট পড়ার হার প্রকাশ করে তাও বিরোধী দলগুলির প্রবল চাপে।এই হার প্রাথমিক হারের চেয়ে অনেকটাই বেশী। ৬০ শতাংশ থেকে বেড়ে হল ৬৬.১৪ শতাংশ। দ্বিতীয় পর্বের ভোটদানের হার ৬০.৯৬ শতাংশ থেকে বেড়ে হল ৬৬.৭১ শতাংশ। কেন এমন হল? নির্বাচন কমিশনের অজুহাত অনেক রাত পর্যন্ত ভোট নেওয়া বা দূরে ভোটকেন্দ্র থাকার কারণে ইত্যাদি। আগেও তো বহু নির্বাচন সংগঠিত হয়েছে, প্রশ্ন করব না তখন কি এসব সমস্যাগুলো ছিল না? তখন তো প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি হয় নি। তাহলে এতদিন একদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত ভোটদানের হার কি করে কমিশন বলতে পারতো? বিরাট সংখ্যক এই বাড়তি ভোট নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে একটা বড় জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছে। এই রিপোর্টে করা অভিযোগের কোন জবাব যদি কমিশন দিতে না পারে তাহলে বলতে হবে নির্বাচন কমিশন নিজেই এই জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত।

যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ১৫ টি রাজ্যের যে ৭৯ টি কেন্দ্র রয়েছে তার মধ্যে বিজেডি শাসিত ওড়িশার ১৮ টি কেন্দ্রে অসদাচরণের অভিযোগ উঠেছে তার মধ্যে ১৩ টিতে জয়ী প্রার্থীর ব্যবধান ৫০ হাজারের কম এবং ভোটের হার বাড়ানো হয়েছে প্রায় ৪২ লক্ষ। যেখানে মোট লোকসভার আসন মাত্র ২১ টি তার মধ্যে ১৮ টি কেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটেছে।গড় ধরলে কেন্দ্রপিছু দুলক্ষেরও বেশী ভোট বেড়েছে প্রাথমিক হিসাবের চেয়ে। বর্তমানে এনডিএ শাসিত অন্ধ্রপ্রদেশে ৪২টি আসনের ১২ টিতে জয়ের ব্যবধান ৫০ হাজারের কম সেখানে ৭ টি আসনে অসদাচরণের অভিযোগ রয়েছে এবং বাড়তি ভোটের সংখ্যা ৪৯ লক্ষ। কেন্দ্রপিছু হিসাবটা আর করে কি হবে?

বিজেপি শাসিত অসমে মোট ১৪ টি আসনের মধ্যে ৯ টি আসনে কম ব্যবধানে জিতেছে বিজেপি। বাড়তি ভোট ১৫ লক্ষ। বিজেপি শাসিত আরেকটি রাজ্য ছত্রিশগড়ে ২৮ টি কেন্দ্রের মধ্যে ৫ টি কেন্দ্রে বাড়তি ভোটের সংখ্যা হল ৯.৫৪ লক্ষ। এর মধ্যে ৩ টি কেন্দ্রে ব্যাপক নিয়মভঙ্গ ও অসদাচরণের অভিযোগ রয়েছে।

বিজেপি শাসিত আরেকটি রাজ্য হরিয়ানায় ৩টি কেন্দ্রে ভোটের গরমিল ১২.৯১ লক্ষ ভোট। এখানে ৫ টিতে অসদাচরণের অভিযোগ আছে। এরপরেও বলতে হবে নির্বাচনে কোন কারচুপি হয় নি?

এনডিএ পরিচালিত আরেকটি রাজ্য বিহার। সেখানে ৫ টি কেন্দ্রে ভোট বেড়েছে ১১.৬ লক্ষ। সবগুলোতে অভিযোগ আছে এগুলিতে নির্বাচন ঠিকঠাক হয় নি।

একই দলের অর্থাৎ বিজেপি জোটের পরিচালনাধীন রাজ্য মহারাষ্ট্রে বেড়েছে সবথেকে বেশী ভোট। সংখ্যার হিসাবে তা ৮২.৬৩ লক্ষ। মোট ১১ টি কেন্দ্রে অভিযোগ ছিল বিরোধীদের। তার মানে কতটা অসদাচরণ করা হয়েছে বোঝা যায়।

বিজেপি শাসিত আরেকটি রাজ্য রাজস্থানে এই হিসাব ৫ টি লোকসভা কেন্দ্রের যেখানে ২৯.৩ লক্ষ বাড়তি ভোট যোগ হয়েছে। কর্নাটকে ৬ টি কেন্দ্রে ভোট বেড়েছে ২২.৩৩ লক্ষ। পশ্চিমবাংলাতে ১০ টি কেন্দ্রে ৩৬.৭১ লক্ষ ভোট বাড়তি যোগ হয়েছে। তামিলনাড়ুতেও বাড়তি ভোটের পরিমাণ ৪৬ লক্ষ।

এইসব তথ্যগুলি সামনে রেখে উক্ত সংস্থাটি উপসংহার টেনেছে জনপ্রতিনিধি আইন ১৯৫১ এর ৫৯ নং ধারার স্পষ্ট লঙ্ঘন (bluntly violation of the provisions of Representation of Peoples Act) এখানেই শেষ নয় তাদের রিপোর্টে বলা হয়েছে নির্বাচন ঘোষণার মাত্র দুদিন আগে দুজন নির্বাচন কমিশনের সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে যেখানে তিন সদস্যদের মধ্যে একজন সদস্য প্রধান

বিচারপতিকে বাদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পছন্দের একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে নতুন তৈরী অগণতান্ত্রিক নিয়মে করা হয়েছিল। এর কারণ একটাই মোদী ভয় পাচ্ছেন হঠাৎ যদি কমিশনের কোন সদস্য এত অনৈতিক কাজ করতে না চান তাহলে অন্তত ২-১ ভোটে তাকে বাঁচাতে পারে কমিশন।

গত লোকসভা নির্বাচনে অন্যতম নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসাকে মনে আছে? নির্বাচনী আচরণবিধি বার বার লঙ্ঘন করেছিলেন মোদী ও অমিত শাহ। ঘৃণা ও বিভেদমূলক ভাষণ তো ছিলই,ছিল কাঁড়ি কাঁড়ি মিথ্যার বেসাতি। অশোক লাভাসা এর বিরুদ্ধে বার বার ব্যবস্থার সুপারিশ করলেও তা খারিজ হয়ে যায়, বাকি দুজন সদস্য রাজী না হওয়ায়।তাই এবার প্রধান বিচারপতিকে নির্বাচকমণ্ডলী থেকে বাদ দিয়ে নিজের বশংবদ এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে তিন সদস্যের কমিটতে ঢোকাতে হল। এবারে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে হয়ত সংসদের বিরোধী নেতাকেও বাদ দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই কমিটিতে ঢোকাবার চেষ্টা হত।

এবারের নির্বাচনেও দুবেলা ক্রমাগত ঘৃণা ও মিথ্যাভাষন এবং অন্য ধর্মের প্রতি বিষোদ্গার করা ছাড়াও কংগ্রেসের ইস্তাহারের ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন মোদী , শাহ দুজনেই। সমস্ত বিরোধী দলগুলি একযোগে এর প্রতিবাদ করা সত্বেও নির্বাচন কমিশন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেয় নি।একটা আলুভাতে মার্কা চিঠি বিজেপির সভাপতি জেপি নড্ডাকে পাঠানো ছাড়া।

উক্ত সংগঠনের পক্ষে বেশ কয়েকজন আইএএস, আইআইটির অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞ, আইনজীবী ও বিভিন্ন দল ও সংগঠনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্বাক্ষর করেছেন। রিপোর্টের শেষে যে বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হয়েছে তার কয়েকটি লাইন তুলে দিয়ে এই নিবন্ধে ইতি টানছি তা হল "The notice,moreover seeks explanation and accountability on illogical and chaotic scheduling of election voting misconduct, the issue of large scale spurious injection of votes,malpractices and voluntary manipulation, serious violation of model code of conduct, form 17c not distributed to the voting agents, delay in releasing voter turn out, Returning officer violated statutory directions. The notice provides detailed tables on the calculated increase in vote percentage, the discrepencies between vote polled and vote conducted and makes a strong case for independent enquey and investigation.

হকারি ও বুলডোজার রাজ (তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশ ও হক কথা)

বিগত দুই সপ্তাহ আমাদের যৌথ তথ্যানুসন্ধান ও সমীক্ষা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মোট ১২ টি মিউনিসিপালিটি ও মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশানে। হকার, সাধারণ মানুষ, হকার ইউনিয়নের নেতৃত্বর সঙ্গে কথা হয়েছে। কয়েকটি পৌরসভায় উচ্ছেদ হওয়া হকারদের মধ্যে গিয়ে সমীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৬ জুলাই, ২০২৪ আমাদের পক্ষ থেকে সামগ্রিক তথ্যানুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে এই প্রাথমিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হল। আমরা আশা রাখি, খুব শীঘ্র আমরা সম্পূর্ণ মুদ্রিত প্রতিবেদন প্রকাশ করবো।

তথ্যানুসন্ধান থেকে যা উঠে এসেছেঃ

১। কোথাও উচ্ছেদের আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নোটিশ দেওয়ালে বা পাশের লাইট পোস্টে লটকে দেওয়া হয়েছে, যেমন সিউরি, রামপুরহাট ইত্যাদি শহরে।

২। নোটিশ দেওয়া হয়নি এমন স্থান প্রচুর। কৃষ্ণনগর, বোলপুর ইত্যাদি শহরে নোটিশ না করে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

৩। সর্বত্র মাইকে প্রচার করে 'নিজের দোকান নিজে ভেঙে দাও নাহলে পুরসভা থেকে ভেঙে ফেলা হবে' এই হুমকি দেওয়া হয়।

৪। উচ্ছেদ পর্বে বুলডোজার বা জেসিবি ব্যবহার হয় রামপুরহাট, বোলপুর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, ইংলিশবাজার সহ আরও শহরে।

৫। গত ৩০ জুন, প্রতিরোধ আন্দোলন হয় রামপুরহাট শহরে। কিন্তু পরবর্তীকালে তা টিকে থাকেনি। সিউরিতে প্রতিরোধ আন্দোলন করে হকাররা উচ্ছেদ ঠেকাতে সক্ষম হয়েছে। এই ব্যতিক্রম বাদে বেশিরভাগ শহরে কোন প্রতিরোধ হয়নি। যেমন, কৃষ্ণনগরে হকাররা বুঝে উঠতে পারেননি, কি করতে হবে।

৬। 'বুলডোজার রাজ' চলে ২৬ জুনের পর থেকে, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর ১ মাসের জন্য সব বন্ধ রাখার ঘোষণা সত্ত্বেও। উচ্ছেদকে বাস্তবায়িত এবং ত্বরান্বিত করেছে অতিরিক্ত শাসক দল নির্ভরতা।

৭। পুরসভা-পুলিশ-প্রশাসন এবং শাসক দলের প্রকাশ্য উচ্ছেদ-মুখী অবস্থান দেখা গেছে।

৮। তৃণমূলের হকার ইউনিয়ন 'মূক' থেকেছে, উচ্ছেদকে বকলমে সমর্থন করেছে। রামপুরহাটে যৌথ আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা করেছে। উচ্ছেদ হওয়ার পর ধারেকাছে দেখা যায়নি বর্ধমান শহরে ও অন্যত্র।

৯। বোলপুরে চিত্রা মোড়ে আগে পুনর্বাসন পাওয়া হকার আর না পাওয়া হকারদের মধ্যে বিভেদ দেখা গেছে। একইভাবে মাথাভাঙা, ইংলিশবাজারে হকারদের নিজেদের মধ্যেই নতুন হকার জোন পাওয়ার লড়াইয়ে বিভেদ দেখা গেছে।

১০। উচ্ছেদ পর্বে কাউকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি। বহু হকার বাধ্য হয়ে হকিং স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র ফিরে গেছে।

১১। হকার উচ্ছেদ করে হকারের বসার জায়গায় বড় ব্যবসায়ী বা প্রভাবশালীকে বসানোর আশঙ্কা ও খবর আছে কয়েকটি জায়গায়। যেমন দুর্গাপুরের সিটিসেন্টারের বিগবাজারের সামনে, সেখানে কার পার্কিং করতে লিজ দেওয়া হচ্ছে শাসক দলের প্রভাবশালীকে।

১২। শহর সৌন্দর্যায়নের নামে হকার উচ্ছেদ হচ্ছে। বর্ধমানের বি বি রোডের 'বর্ধমান অর্কেড', এখানে হকার উঠিয়ে সৌন্দর্যায়নের কাজ উচ্ছেদের পরেপরেই শুরু হয়েছে।

১৩। কোলকাতার বাইরে হকাররা টাউন ভেন্ডিং কমিটির অস্তিত্ব আছে কিনা জানে না। তাঁদের ভেন্ডিং সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়নি।

আমাদের দাবিসমূহঃ

১। অবিলম্বে হকার উচ্ছেদ এবং উচ্ছেদের যাবতীয় পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে।

২। রাস্তার বিক্রেতা বা স্ট্রিট ভেন্ডার (প্রটেকশন অফ লিভলিহুড অ্যান্ড রেগুলেশন অফ স্ট্রিট ভেন্ডিং) অ্যাক্ট, ২০১৪ বলবৎ করতে হবে।

৩। স্ট্রিট ভেন্ডার (প্রটেকশন অফ লিভলিহুড অ্যান্ড রেগুলেশন অফ স্ট্রিট ভেন্ডিং) অ্যাক্ট, ২০১৪-র ৩ নম্বর ধারা মোতাবেক পুনরায় কোন উচ্ছেদ করা চলবে না।

৪। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন অনুমোদিত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য রাস্তার বিক্রেতা ইউনিয়ন থেকে প্রতিটি পৌরসভা এবং কর্পোরেশনে টাউন ভেন্ডিং কমিটি (টিভিসি) গঠন করতে হবে। টাউন ভেন্ডিং কমিটির ব্যাপারে অবহিত করাতে হবে এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। টাউন ভেন্ডিং কমিটিকে অবশ্যই বিদ্যমান হকারদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং তাদের ভেন্ডিং সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে।

৫। উচ্ছেদ করা সকল হকারদের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৬। আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে উচ্ছেদ করা সমস্ত হকারদের জন্য বর্তমান হকিং স্থানে পুনর্বাসন দিতে হবে।

৭। আইনের পরিপন্থী ও শহর সৌন্দর্যায়নের পরিপন্থী এই অজুহাতে হকার উচ্ছেদ চলবে না। শহর সৌন্দর্যায়নের জন্য হকারদের জীবিকায় আঘাত চলবে না।

৮। প্রয়োজনে হকারদের জীবিকার সুরক্ষার জন্য নতুন আইন আনতে হবে। হকার সহ অন্য নাগরিকদের জীবিকার গ্যারান্টি প্রদানে সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে।

আয়োজক

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতি, রাইট টু ফুড এণ্ড ওয়ার্ক ক্যাম্পেইন, অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিক সংগ্রামী মঞ্চ, পিপুলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টি, আমরা এক সচেতন প্রয়াস।

বিজেপি'র ঘোলা জলে মৎস্য স্বীকার

বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে যখন মরণপণ মুক্তি সংগ্রাম চলছিল, তখন ভারতীয় জনসংঘ অর্থাৎ আজকের বিজেপির ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ নেতিবাচক। অত্যাচারী ইয়াহিয়া খানের সেনারা ৩০ লক্ষ্য বাঙালিকে হত্যা করে। হাজার হাজার মা-বোন ধর্ষিতা হন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চিনা সম্প্রসারণবাদ এই হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করে। ১ কোটি শরণার্থী আমাদের দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। মহা পরাক্রমশালী আমেরিকা ও চীনের জোটকে প্রতিহত করার জন্য ইন্দিরাজি ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

জনসংঘ নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির বিরোধিতা করেন।তিনি মার্কিন প্রশাসনের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি। বিপন্ন শরণার্থীদের পাশেও দাঁড়ান নি।

বর্তমানে বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি এই দেশে হিন্দু দরদী সেজে সীমাহীন সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাচ্ছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ নিন্দনীয়।কিন্তু আশার কথা বহু জায়গায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বহু মানুষ হিন্দুদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিজেপির মিথ্যা মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

এবার লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে বিজেপির বিপর্যয় ঘটেছে। রামমন্দির করেও খুব ফায়দা হয়নি। সামনে ১০ বিধানসভার উপ নির্বাচন। তাই যোগী আদিত্যনাথ কে 'হিন্দু খাতরে মে হ্যায়' বলে চেঁচাতে হচ্ছে।